

LEST WE FORGET

The Enterprise and Its Soul



FERDINANDO FREGA

যাতে আমরা না ভুলি

SEMANTIC REALITY 2026 · SHAREHOLDERS 05

পণ্য, পেটেন্ট, ব্যাচ কোড, ব্লাইন্ড টেস্ট, ট্রান্সফার প্রাইস, অপারেটিং মার্জিন, ডিভিডেন্ড। গোটা শিল্প-শৃঙ্খলটাকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা হয়েছে, আর শেষ হয়েছে শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে লেখা এক চিঠিতে, যা এর কোনো কিছুকেই নরম করতে রাজি নয়।

সূচিপত্র

মানুষ সবসময় অন্য মানুষের সঙ্গে দেখা করে। এটাই প্রথম নিয়ম, বাকি সব নিয়মের আগে। টাকার আগে, ক্ষমতার আগে, এমন প্রতিটি উদ্যোগের আগে, যে কোনোদিন এর নাম না নিয়েই এই নিয়মের ওপর নিজেকে গড়ে তুলবে।

আর এই অন্তহীন সাক্ষাতের মধ্যেই আকার নেয় নানা নিয়তি। কেউ হয়ে ওঠে ব্যক্তিত্ব, আর কেউ দূর থেকে তার স্বপ্ন দেখেই থেকে যায়, কোনোদিন সেই চৌকাঠ পেরোয় না। তারপর আসে গরিবেরা, যারা সম্পদের স্বপ্ন দেখে যেন তা এক তালাবন্ধ দরজা, যাকে ভেঙে খুলতে হবে। আর আসে ধনীরা, যারা সেই দরজার ভেতরে একবার ঢুকে আবিষ্কার করে আরেক খিদে: তারা ক্ষমতার স্বপ্ন দেখে, যা তাদের সম্পদ, যাদের আর টাকার দরকার নেই, কিন্তু যারা এখনও জানে না কীভাবে দরকার থাকাটাই ছেড়ে দিতে হয়।

ব্যক্তিত্ব, দারিদ্র্য, সম্পদ, ক্ষমতা: মনে হয় চারটি আলাদা নিয়তি, চারটি পথ, যারা কখনও একে অপরকে ছোঁয় না। কিন্তু শেষে, যে এই সবকটা পথ হাঁটে, সে আবিষ্কার করে যে সবগুলোই একই বিন্দুতে নিয়ে যায়, আর সেখানে থেকে যায় শুধু একটি জিনিস, একমাত্র জিনিস যা কখনও ফুরোয় না আর কখনও বদলানো যায় না: মানুষ।

যে মানুষদের প্রতি আমরা সারাজীবন নিবেদিত থাকি — একজন বাবা, একজন মা, একটি সন্তান, যে না চেয়েও আমাদের শিখিয়েছে, যে না বলেও আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছে — তারা যাত্রার কোনো পর্যায়

নয়। যাত্রা শেষ হলে তারাই থেকে যায়, আর তারাই, আমাদের অজান্তে, দিনের পর দিন আমাদের আজকের আমরা করে তুলেছে, আমরা কে হব তা বেছে নেওয়ার আগেই।

এই ইশতেহারের জন্ম সেখান থেকেই। সাফল্যের কোনো বিমূর্ত ধারণা থেকে নয়, বরং এই স্বীকৃতি থেকে যে মানুষের গড়া প্রতিটি ব্যক্তিত্ব, প্রতিটি ভাগ্য, প্রতিটি ক্ষমতা নিজের ভেতরে বয়ে বেড়ায় অন্য কারও ছাপ — এমন কারও, যার প্রতি সে নিবেদিত ছিল, প্রায়ই না জেনে, প্রায়ই তা বলার পক্ষে অনেক দেরিতে।

যে এই নিয়ম ভোলে, সে গড়ে তোলে উদ্যোগ, সাম্রাজ্য, ভাগ্য, যেগুলো তার নিজের বলে মনে হয়, কিন্তু কখনও সত্যিই তার নয়। যে এটা মনে রাখে, সে এমন কিছু গড়ে, যা যে নামই বহন করুক, সবসময় থেকে যায় ফিরিয়ে দেওয়া নিবেদনের এক কাজ হয়ে।

একটি উদ্যোগের জন্ম পুঁজি থেকে হয় না। তার জন্ম হয় একটি অভিপ্রায় থেকে।

কেউ একজন, কোনো এক মুহূর্তে, ঠিক করেছিল যে একটা জিনিসের অস্তিত্ব থাকা উচিত — বাজার চেয়েছিল বলে নয়, বরং একটা ইচ্ছা তাকে অস্তিত্বে ঠেলে দিয়েছিল বলে। সেই ইচ্ছাই প্রথম সত্যিকারের শেয়ারহোল্ডার, কেউ টাকা গোনার আগেই।

এই জিনিস, একবার আকার নিলে, সবসময় একটা নাম পায়: তাকে বলে পণ্য। যখন তাকে পরিষেবা বলা হয়, তখনও সারবস্তু বদলায় না। পরিষেবা আর কিছুই নয়, এমন এক পণ্য, যা দেওয়ার মুহূর্তেই ভোগ হয়ে যায় — হয়তো অদৃশ্য, হয়তো অস্পৃশ্য, কিন্তু তাই বলে উদ্দেশ্যে কম বাস্তব নয়। সেটা এমন কোনো বস্তু হোক যা গ্রহীতার হাতে থেকে যায়, কিংবা এমন কোনো আচরণ যা ঘটার মুহূর্তেই সম্পন্ন হয়ে ফুরিয়ে যায়, যুক্তি বদলায় না: সবসময় একটা রূপ থাকে, আর সেই রূপ সবসময় অন্য কারও দিকে চালিত। এমন কোনো পণ্য নেই, যা শেষ পর্যন্ত একটি দেওয়া পরিষেবা নয়। আর এমন কোনো পরিষেবা নেই, যা গ্রহীতার মধ্যে পণ্যের মতো কিছু রেখে যায় না: একটা স্মৃতি, একটা উপকার, একটা চিহ্ন।

এই উদ্দেশ্যেই একটি উদ্যোগের জন্ম হয়। মুনাফা নয় — যা একটা ফল, কারণ নয় — বরং এই রূপটিকে তার কাছে পৌঁছে দেওয়া, যার এর দরকার আছে বা যে এর থেকে মূল্য পায়।

এর পরে যা কিছু আসে — কাঠামো, স্তরবিন্যাস, ব্যালান্স শিট, ব্র্যান্ড — সবই ভারী। প্রয়োজনীয়, কখনও কখনও সুন্দরও, কিন্তু প্রায়ই তাকে বাড়ি বলে ভুল করা হয়। ভারী বাড়ি নয়। বাড়ি হল উদ্দেশ্য: সেই পণ্য, সেই পরিষেবা, ঠিক সেই অভিপ্রায় নিয়ে পৌঁছে দেওয়া, যা নিয়ে তাকে প্রথম কল্পনা করা হয়েছিল।

আর উদ্দেশ্য নিজেকে নিজে পরিচালনা করে না। সে ততক্ষণই টিকে থাকে, যতক্ষণ কেউ — একজন, বা একাধিক — তাকে বয়ে নিয়ে চলে, মনে রাখে প্রথম সিদ্ধান্তটা কেন নেওয়া হয়েছিল, আর কেন সেই রূপটিকে অন্য কারও কাছে পৌঁছতেই হত। যে মুহূর্তে সেই ইচ্ছা হারিয়ে যায়, উদ্যোগ চলতে থাকে, কিন্তু আর জানে না কোথায়। উৎপাদন করতে থাকে, কিন্তু আর জানে না কার জন্য। সে দক্ষ হয়ে ওঠে, জীবিত না থেকেই।

এটাই বহু প্রতিষ্ঠানের নিঃশব্দ সংকট: সম্পদের অভাব নয়, স্মৃতির অভাব। প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে যায়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম, নিয়োগের পর নিয়োগ, যতক্ষণ না পড়ে থাকে এক যন্ত্র, যে এমন সব কাজ করে চলে যার কারণ হারিয়ে গেছে — যে তৈরি করতে বা পরিষেবা দিতে থাকে, আর জানে না কেন সেই জিনিসটির, ঠিক সেই নির্দিষ্ট জিনিসটির, অস্তিত্ব থাকতেই হত। এই ইশতেহার লেখা তার জন্য, যে, যে কাঠামোতেই সে থাকুক, প্রশ্ন করে চলে: এই জিনিসটার অস্তিত্ব কেন, এটা কার জন্য তৈরি, আর আমি কি এখনও সেই কারণের সেবা করছি — নাকি শুধু তার ছায়ার?

এটা কোনো একটি উদ্যোগ, একটি খাত, একটি যুগের নয়। এটা তার, যে কখনও অনুভব করেছে একটা প্রতিষ্ঠান যা করে আর যা করার জন্য তার জন্ম হয়েছিল, তার মধ্যকার ফাঁক — আর ঠিক করেছে, চূপচাপ হোক বা জোর গলায়, সেটা বন্ধ করবে।

আমি এই বই সিইওদের সঙ্গে কথা বলার জন্য লিখিনি, প্রেসিডেন্টদের সঙ্গেও নয়। তারা কর্মচারী — এমনকি যখন তারা এমন উপাধি বহন করে যা ক্ষমতার মতো শোনায়, তখনও তারা অন্য কারও কাছে জবাবদিহি করে, এমন এক দায়িত্ব পালন করে যা তারা একা বাছেনি আর কাল সকালেই হারাতে পারে। তাদের সঙ্গে কথা বলা মানে তাদের সঙ্গে কথা বলা, যারা পরিচালনা করে, তাদের সঙ্গে নয়, যারা উদ্দেশ্যের মালিক।

আমি এই বই লিখেছি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য। তাদের ভূমিকার জন্য নয় — বার্ষিক সভায় ভোট, প্রত্যাশিত ডিভিডেন্ড, পোর্টফোলিওর অংশ — বরং সেই ভূমিকার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির জন্য, যাকে ব্যবস্থা কথা বলতে দেওয়ার আগেই একটা ভূমিকার পোশাক পরিয়ে দিয়েছে।

কারণ সমাজ, অর্থনৈতিক হোক বা নাগরিক, প্রত্যেককে চেনার আগেই একটা ছাঁচ দিয়ে দেয়। শেয়ারহোল্ডারকে দেয় যুক্তিবাদী বিনিয়োগকারীর ছাঁচ, যে শুধু সংখ্যা দেখে আর বাকি সবকিছুকে আওয়াজ বলে ধরে। কর্মচারীকে দেয় যে কাজ সম্পাদন করে, তার ছাঁচ। প্রতিষ্ঠাতাকে দেয় দূরদর্শীর ছাঁচ, প্রায়ই অন্যদের লেখা এক জীবনীতে আগেই মমি করে রাখা। এগুলো তৈরি পোশাক, পাইকারি দরজির হাতে কাটা, মানুষটি সেটা গায়ে লাগে কিনা বেছে নেওয়ার আগেই পরানো।

আমি কথা বলতে চাই তার সঙ্গে, যে সেই ছাঁচের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ বাস্তবতা, সত্যিকারের বাস্তবতা, ছাঁচ যা দেখতে দেয় তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যে শেয়ারহোল্ডারকে মনে হয় শুধু সংখ্যা দেখে, সে প্রায়ই কোথাও চাপা দিয়ে বয়ে বেড়ায় সেই একই নির্বাক প্রশ্ন, যা ছিল উদ্যোগের প্রতিষ্ঠাতার: এই জিনিসটার অস্তিত্ব কেন, আর আমি কি এখনও সেই কারণের সেবা করছি? শুধু কেউ কখনও তাকে এটা জিজ্ঞেস করতে দেয়নি, কারণ তার জন্য বরাদ্দ ভূমিকা ছিল অন্য।

এই বই ক্ষমতার সরকারি পথ ধরে চলে না — যারা পরিচালনা করে তাদের হাত দিয়ে নয়, যারা অন্যদের হয়ে কথা বলে তাদের হাত দিয়ে নয়, যারা খবর হেঁকে দেয় তা নিজের পুঁজি দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া মানুষের কাছে পৌঁছানোর আগে, তাদের হাত দিয়েও নয়। এটা সরাসরি যায়। যে

সারবস্তুটা যাপন করেছে, তার কাছ থেকে তার কাছ, যে কাগজে-কলমে উদ্দেশ্যের মালিক।

কারণ যদি একজন শেয়ারহোল্ডারও, এটা পড়ে, এক মুহূর্তের জন্য একটা ভূমিকা হয়ে থাকা ছেড়ে আবার একজন মানুষ হয়ে ওঠে, যে জিজ্ঞেস করে সে যা বিনিয়োগ করেছে কেন করেছে — তাহলে এই বই সেটা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে, যা করার জন্য এটা লেখা হয়েছিল।

এই বইয়ের কোনো কাহিনি নেই। এটা শুরু, মাঝখান আর শেষ সহ কোনো গল্প বলে না, আর কোনো নির্দিষ্ট ক্রমে পড়ার দাবিও করে না। এটা ছোট ছোট অধ্যায়ে গড়া, প্রতিটি নিবেদিত একটি শব্দ, একটি ধারণা, সমকালীন উদ্যোগের একটি যন্ত্রাংশের প্রতি — পণ্য, পেটেন্ট, ম্যানেজমেন্ট, ব্যালান্স শিট, শেয়ারবাজার — আর প্রতিটি, আলাদা করে নিলে, একটা সম্পূর্ণ ভাবনা হিসেবে পড়া যায়।

কিন্তু এই আপাত টুকরো টুকরো ভাবের নিচে আছে একটিমাত্র সুতো, যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি পাতা জুড়ে চলে: যে অভিপ্রায় একটি উদ্যোগের জন্ম দেয় আর সেই অভিপ্রায় প্রায় সবসময় নিজের চারপাশে যে কাঠামো গড়ে তোলে, তাদের মধ্যে ক্রমশ বাড়তে থাকা দূরত্ব। প্রতিটি অধ্যায় এই দূরত্বকে দেখে ভিন্ন এক কোণ থেকে — কখনও প্রযুক্তিগত, কখনও মানবিক, কখনও তার সততায় প্রায় নির্মম — কিন্তু মূল প্রশ্নটা সর্বত্র একই থাকে: এই জিনিসটার অস্তিত্ব কি এখনও সেই কারণেই, যে কারণে তার জন্ম হয়েছিল?

এই পাতাগুলোতে তুমি কোনো বাস্তব কোম্পানির নাম পাবে না। এটা কাকতালীয় নয়, আইনি সাবধানতাও নয়: এটা একটা বাছাই। এই বই কোনো নির্দিষ্ট উদ্যোগের কথা বলে না, কারণ এটা সবগুলোর কথা বলে, আর বিশেষ করে কোনোটারই নয় — এমন প্রতিটি কাঠামোর কথা, যাকে কোনো মানুষ কখনও অস্তিত্বে আনতে চেয়েছে, আর যা পরে, সময়ের সঙ্গে, ভুলে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েছে কেন তার জন্ম হয়েছিল। যে বছরের পর বছর কোনো উদ্যোগের ভেতরে কাজ করেছে, যে কোনো খাতেই হোক, সে এই অধ্যায়গুলোতে চিনে নেবে এমন কিছু, যা সে নিজে যাপন করেছে। বইটা তার নিজের কোম্পানির কথা বলছে বলে

নয়, বরং এটা সেই যুক্তির কথা বলে, যা সামান্য হেরফেরে প্রায় সবগুলোর মধ্য দিয়ে বয়ে যায়।

এই বই তাদের জন্য লেখা নয়, যারা ওপর থেকে একটা উদ্যোগ পরিচালনা করে — এক্সিকিউটিভ, প্রেসিডেন্ট, সিইও — যদিও তারাও এটা পড়ে এর বহু পাতায় নিজেদের চিনে নিতে পারে। এটা লেখা, সবার আগে, তার জন্য, যে কোনো কিছুর একটা অংশের মালিক, অথচ কখনও তার পুরো সারবস্তু দেখে না: শেয়ারহোল্ডার, বড় আর ছোট, যারা পায় একটা সংখ্যা, আর কালেভদ্রে সেই সংখ্যার পেছনের গল্পটা। তাদেরই কাছে, আর সবার চেয়ে বেশি, এই বই অনুরোধ করে এক মুহূর্ত থেমে পুরো শৃঙ্খলটা দেখতে — পণ্য থেকে শুরু করে তাদের নিজেদের ডিভিডেন্ড পর্যন্ত — এমন কিছুর মালিক হয়ে থাকা চালিয়ে যাওয়ার আগে, যার ঠিক কী যে তারা মালিক, তা তারা জানে না।

এটা সহজ সমাধান দেওয়ার বই নয়, যা বর্ণনা করে তা সারিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া কোনো ম্যানুয়ালও নয়। এটা, আরও বিনয়ের সঙ্গে, একটা প্রশ্ন করার আমন্ত্রণ — একই প্রশ্ন, তিরিশটি ভিন্ন রূপে বারবার — আর সেটাকে সঙ্গে নিয়ে চলার, পরের বার যখন তুমি একটা ব্যালান্স শিট দেখবে, একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তি পড়বে, একটা ডিভিডেন্ড পাবে, কিংবা শুধু সকালে কোনো অফিসে ঢুকবে: এই জিনিসটার অস্তিত্ব কি এখনও সেই কারণেই, যে কারণে তার জন্ম হয়েছিল, নাকি আমি, না জেনেই, শুধু তার ছায়ার সেবা করছি?

পণ্য

প্রতিটি উদ্যোগ, বাকি সবকিছু খুলে ফেললে, একটিমাত্র জিনিসে এসে দাঁড়ায়: একটা পণ্য।

তাকে কী নামে ডাকো, তাতে কিছু যায় আসে না। পরিষেবা, অভিজ্ঞতা, সমাধান, বাড়তি মূল্য — এগুলো সেই শব্দ, যা মার্কেটিংয়ের ভাষা বাড়িয়ে চলেছে, যাতে চিরকাল একই থাকা এক প্রাচীন আচরণকে নতুনের মতো দেখায়: কেউ কিছু করে, আর অন্য কেউ তা গ্রহণ করে। পণ্য হল এই বিনিময়, যাকে স্থির, পুনরাবৃত্তিযোগ্য, চেনা যায় এমন করে

তোলা হয়েছে। এটা সেই প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়, যা এমন এক রূপ নিয়েছে, যে রূপ তার জন্মের মুহূর্ত পেরিয়েও বেঁচে থাকতে পারে।

কিন্তু পণ্য, একবার জন্মালে, এমন এক ঝুঁকি নেয়, যা কোনো প্রতিষ্ঠাতা শুরুতে আঁচ করে না: সে নিজের এক জীবন বাঁচতে শুরু করে। একটা আচরণ হিসেবে মনে রাখার আগেই সে হয়ে যায় একটা সংখ্যা। একটা প্রতিশ্রুতি হিসেবে মনে রাখার আগেই সে হয়ে যায় বাজারের অংশ। আর এখানেই প্রতিটি বেড়ে ওঠা উদ্যোগের প্রথম নিঃশব্দ বিশ্বাসঘাতকতা ঘটে যায়: পণ্য আর কোনো প্রয়োজনের উত্তর থাকে না, হয়ে ওঠে এমন এক কাঠামোর যুক্তি, যাকে এখন টিকে থাকার জন্য শুধু বিক্রি করে যেতে হয়।

যে কোনো উদ্যোগের ভেতরে বছরের পর বছর কাজ করে, মাসের পর মাস নয়, সে এই রূপান্তর কাছ থেকে দেখে। সে দেখে সেই দিনটা, যেদিন একটা মিটিং আর পণ্যটা কে পাবে সেই কথা বলে না, বলে শুধু কতটা উৎপাদন করা যাবে। এটা কোনো ক্যালেন্ডারে দাগানো দিন নয়। কেউ এর ঘোষণা দেয় না। কিন্তু সেদিন থেকে পণ্য আর মূর্ত হয়ে ওঠা এক উপহার নয়, হয়ে গেছে এক অজুহাত।

তবু সত্যিকারের পণ্য এখনও নিজের ভেতরে বয়ে বেড়ায় প্রথম অভিপ্রায়ের চিহ্ন — এমনকি যখন যে কাঠামো তাকে তৈরি করে, সে তা ভুলে গেছে। একটা ভালোভাবে তৈরি বস্তু, একটা ভালোভাবে সম্পন্ন আচরণ, তার রূপে বয়ে চলে তার ছাপ, যে প্রথম তার কথা ভেবেছিল, এমনকি যখন এখন যে তাকে তৈরি করে, সে আর জানে না সে কে ছিল।

পণ্যকে তার আসল জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া — উৎপাদন নয়, রাজস্ব নয়, বরং একজন সত্যিকারের মানুষের সত্যিকারের প্রয়োজনের উত্তর — হয়তো আজ যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ভেতরে কাজ করা যে কারও কাছে এখনও থাকা একমাত্র বৈপ্লবিক কাজ। পণ্য বদলানোর দরকার নেই। দরকার মনে রাখার, কার জন্য তাকে ভাবা হয়েছিল।

পেটেন্ট

পেটেন্টের জন্ম একটা ধারণাকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু বাস্তবে সে রক্ষা করে শুধু তার রূপ — কখনও সেই অভিপ্রায় নয়, যা তাকে জন্ম

দিয়েছিল।

তুমি একটা যন্ত্রকৌশল, একটা সূত্র, একটা প্রক্রিয়ার পেটেন্ট নিতে পারো। কিন্তু কেউ কেন সেটা আবিষ্কার করতে চেয়েছিল, সেই কারণের পেটেন্ট নিতে পারো না। অথচ ঠিক সেই কারণটাই, যন্ত্রকৌশল নয়, প্রতিটি আবিষ্কারের সবচেয়ে মূল্যবান আর সবচেয়ে ভঙ্গুর অংশ — আর এটাই একমাত্র জিনিস, যা পৃথিবীর কোনো পেটেন্ট অফিস কোনো দলিলে লিখে রাখতে জানে না।

এ থেকে তৈরি হয় এক বিপজ্জনক বিভ্রম: যার হাতে পেটেন্ট, সে ভাবে ধারণাটা তার। কিন্তু তার আছে শুধু অন্যদের নকল করা থেকে আটকানোর আইনি অধিকার — এই নৈতিক অধিকার নয় যে সে বলবে, সে এটা জন্ম দিয়েছে সেই একই কারণে, যে কারণে এটা কল্পিত হয়েছিল। একটা কোম্পানি অধিগ্রহণের মাধ্যমে, একীভবনের মাধ্যমে, বাজারে সাধারণ কেনাকাটার মাধ্যমে একটা পেটেন্ট উত্তরাধিকারে পেতে পারে, আর সেই মুহূর্ত থেকে আবিষ্কারটাকে নিজের বলে বলতে পারে — যখন যে ইচ্ছা তাকে জন্ম দিয়েছিল, তা প্রায়ই থেকে গেছে এমন একজন মানুষের মাথায়, যে আর সেখানে কাজ করে না, বা আর বেঁচে নেই।

এটাই প্রতিটি কাঠামোর নিঃশব্দ প্যারাডক্স, যা ধারাবাহিকতার বদলে জমিয়ে জমিয়ে বড় হয়: সে পেটেন্ট জমায় যেভাবে লোকে ট্রফি জমায়, কিন্তু একের পর এক হারিয়ে ফেলে সেই কারণগুলো, যার জন্য সেই ট্রফিগুলো জেতা হয়েছিল। পেটেন্ট থেকে যায়। কেন, তার স্মৃতি থাকে না।

যার হাতে পেটেন্ট আছে আর যে সেটা অর্জন করেছে, তাদের মধ্যে তীক্ষ্ণ তফাত। প্রথমজন একটা অধিকার কিনেছে। দ্বিতীয়জন সমস্যাটার সঙ্গে এতদিন বাস করেছে যে তার সমাধানের অধিকার অর্জন করেছে। যে কোম্পানিগুলো এই দুটোকে গুলিয়ে ফেলে, তারা শেষে আইনের জোরে এমন কিছু রক্ষা করে, যা তারা আর মানুষের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারে না — আর যে আবিষ্কার কেউ আর ব্যাখ্যা করতে পারে না, তা যত ভালোভাবেই রক্ষিত হোক, আধমরা হয়েই আছে।

হয়তো সত্যিকারের পেটেন্ট, যা কোনো আইন নথিভুক্ত করতে পারে না, তা হল মনে রাখার ক্ষমতা, একটা জিনিস কেন আবিষ্কার করা হয়েছিল। যে এটা হারায়, সে তখনও আদালতে জিততে পারে। কিন্তু যা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা সে ইতিমধ্যেই হারিয়েছে।

কোড, ব্যাচ, কারখানা

একদিন কেউ ঠিক করল, যা কিছু উৎপাদিত হয়, তার গায়ে একটা নম্বর থাকা উচিত। নাম নয়, নম্বর। তেরোটা অঙ্ক, এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগে একটা যন্ত্র যা পড়ে নেয়, আর যা সবকিছু বলতে পারে, শুধু এটা ছাড়া যে জিনিসটার অস্তিত্ব কেন।

বারকোড মিথ্যা বলে না: এটা হয়তো আধুনিক আবিষ্কারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সৎ, কারণ যা সে, তার বাইরে অন্য কিছু হওয়ার ভান করে না। সে কোনো গল্প বলে না। সে শনাক্ত করে, তালিকাভুক্ত করে, একটা বস্তুকে পৃথিবী জুড়ে ঘুরতে দেয়, কাউকে জিজ্ঞেস করতে হয় না কে এটা বানিয়েছে বা কেন। এটা দক্ষ করে তোলা নামহীনতা, প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে অনুবাদ করা এমন এক ক্রমে, যা শুধু একটা যন্ত্র পড়তে পারে — কখনও মানুষের চোখ নয়।

আর তারপর আছে ব্যাচ। ব্যাচ হল সেই ন্যূনতম স্মৃতি, যা একটা উদ্যোগ রাখতে রাজি হয়: সে মনে রাখে না সেদিন কাজ করা মানুষটিকে, মনে রাখে না শিফট, পরিশ্রম, সময়মতো ধরা পড়া ভুল বা অনেক দেরিতে আবিষ্কৃত ভুল। সে শুধু মনে রাখে যে, কোনো এক মুহূর্তে, কিছু জিনিসের একটা দল একই লাইন থেকে একসঙ্গে বেরিয়েছিল। এটাই ইতিহাসের একমাত্র রূপ, যা শিল্পব্যবস্থা নিজের সম্পর্কে লেখার অনুমতি নিজেকে দেয়: ক্রমিক নম্বরে গড়া এক ইতিহাস, যা কাজে লাগে শুধু ক্রটি হলে ফেরত ডাকার জন্য, কখনও সাফল্য হলে বলার জন্য নয়।

আর কারখানা, শেষে, সেই জায়গা যেখানে এই সবকিছু একটা শারীরিক দেহ পায়। দেয়াল, যন্ত্র, শিফট, শেড। কারখানা সেই জায়গা, যেখানে প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় আর একটা ধারণা থাকে না, হয়ে যায় আওয়াজ, তাপ, ধাতু বা প্লাস্টিকের গন্ধ, হাজার হাজার বার একইভাবে নড়া হাত। এটা একটা উদ্যোগের সত্যের সবচেয়ে কাছের জায়গা — কারণ সেখানে

পণ্য আর একটা ধারণা হওয়ার ভান করতে পারে না: তাকে অস্তিত্ব পেতে হয়, ওজন থাকতে হয়, একটা প্যালেটে চড়ে দরজা দিয়ে বেরোতে হয়।

কোড, ব্যাচ, কারখানা: এই তিনটি উপায়ে একটা উদ্যোগ নিজেকে আশ্বস্ত করে যে সে যা উৎপাদন করে, তার ওপর তার নিয়ন্ত্রণ আছে। আর এক অর্থে আছেও — সে জানে কোথায়, কখন, কতটা। কিন্তু তিনটির কোনোটাই বলতে পারে না কেন। কোনো বারকোডে প্রথম অভিপ্রায় নেই। কোনো ব্যাচ নম্বর মনে রাখে না সেই ইচ্ছা, যা সেই উৎপাদন লাইনকে অস্তিত্বে এনেছিল। কোনো কারখানা, যত নিখুঁতই হোক, নিজে থেকে মনে রাখে না কে চেয়েছিল যে সেটা থাকুক।

যে সারাজীবন এই তিন জগতের ভেতরে কাজ করে, সে এমন কিছু শেখে, যা কোনো ম্যানুয়াল শেখায় না: সংখ্যার ওপর নিয়ন্ত্রণ কখনও অর্থের ওপর নিয়ন্ত্রণ নয়। তুমি একটা ব্যাচের সবকিছু জানতে পারো, আর কেন সেই পণ্যের অস্তিত্ব থাকতেই হত, সে সম্পর্কে আর কিছুই না জানতে পারো। এখানেই একটা উদ্যোগ নিজেকে হারানোর ঝুঁকি নেয় — নির্ভুলতার অভাবে নয়, তার আধিক্যে, যখন নির্ভুলতা স্মৃতির সেবা না করে তার জায়গা নিয়ে নেয়।

ব্র্যান্ড, নাম, পোশাক

ব্র্যান্ডের জন্ম হয় একটা স্বাক্ষর হিসেবে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে হয়ে যায় একটা পোশাক। আর শেষে, প্রায়ই, সে-ই হয়ে থাকে একমাত্র জিনিস, যা পড়ে থাকে, যখন যে তাকে পরত সে চলে গেছে।

তিনটির মধ্যে নামটাই সবচেয়ে পুরোনো। তাকে একবার বেছে নেওয়া হয়েছিল, কারও দ্বারা, একটা নির্দিষ্ট কারণে — একটা পারিবারিক পদবি, এমন একটা শব্দ যার কোনো অর্থ ছিল, কখনও কখনও এমনকি এক অর্থহীন উদ্ভাবন, যাকে সময় তাৎপর্যে ভরে দিয়েছে। নাম, শুরুতে, এখনও একজন মানুষের সঙ্গে বাঁধা। তখনও আঙুল তুলে দেখানো যায়, কে তাকে বেছেছিল আর কেন।

ব্র্যান্ড হল নামের সেই পরিণতি, যখন সে আর একজন মানুষের থাকে না, থাকতে শুরু করে একটা বাজারের। ব্র্যান্ড নিবন্ধিত হয়, রক্ষিত হয়,

ব্যালান্স শিটে সম্পদ হিসেবে মূল্যায়িত হয় — তার একটা দাম আছে, তাকে কেনা-বেচা যায়, তার চেহারার একটা কমাও না বদলে সে এক মালিক থেকে আরেক মালিকের হাতে যায়। এটা ঠিক সেই মুহূর্ত, যখন একটা নাম আর স্বাক্ষর থাকে না, হয়ে যায় একটা উপরিতল।

পোশাক, শেষে, সেই উপরিতলের ওপর গড়ে তোলা সবকিছু: লোগো, রং, হরফ, বিজ্ঞাপনের কণ্ঠস্বর, প্যাকেটটা কীভাবে খুলতে হবে। পোশাক নকশা করা হয়, পরীক্ষা করা হয়, মিলিমিটারে মাপা হয় — কারণ তাকে করতে হয় শুধু একটা কাজ: যা হয়তো ভেতরে আগেই ফাঁপা হয়ে গেছে, তাকে জীবন্ত, সুসংগত, উদ্দেশ্যপূর্ণ দেখানো। একটা ভালোভাবে তৈরি পোশাক বছরের পর বছর ঢেকে রাখতে পারে সেই ইচ্ছার অনুপস্থিতি, যার তাতে বাস করার কথা ছিল।

এই সেই ঝুঁকি, যা কোনো উদ্যোগ নিজের কাছে স্বীকার করে না: তুমি ভেতরের সবকিছু পুরোপুরি বদলে ফেলতে পারো — মানুষ, মালিকানা, অভিপ্রায়, এমনকি পণ্যও — নাম, ব্র্যান্ড আর পোশাককে ছবছ একই রেখে। জনসাধারণ তাদের চিনে যাবে, তাদের বিশ্বাস করে যাবে, অভ্যাসবশে তাদের কিনে যাবে, না জেনে যে সেই পোশাকের ভেতরে আর হাঁটছে না সেই ইচ্ছা, যা প্রথম তাকে সেলাই করেছিল।

এটা অবশ্যই প্রতারণা নয়। এটা শুধু তা-ই, যা ঘটে, যখন একটা উদ্যোগ সেই মানুষদের ছাড়িয়ে বেঁচে থাকে, যারা তাকে চেয়েছিল। কিন্তু যে এটা জানে — যে দেখেছে পোশাক ছবছ একই থেকে গেছে, যখন বাকি সব বদলে গেছে — সে বয়ে বেড়ায় এমন এক দায়িত্ব, যা খুব কম মানুষের আছে: সে জানে যে একটা ব্র্যান্ড, যত মজবুতই হোক, যত প্রিয়ই হোক, শুধু একটা পোশাক। আর একটা পোশাক, যত সুন্দরই হোক, কখনও নিজে থেকে হাঁটেনি। সবসময় কেউ একজন, ভেতরে, তাকে চালায়।

ব্লাইন্ড টেস্ট, দাম, বাজার

নামের যোগ্য প্রতিটি উদ্যোগে একটা মুহূর্ত আসে, যখন পণ্য থেকে তার নাম খুলে নিয়ে কোনো লেবেল ছাড়া তাকে একজন অচেনা মানুষের সামনে রাখা হয়। একে বলে ব্লাইন্ড টেস্ট, আর কয়েক মিনিটের জন্য বিরল কিছু ঘটে: পণ্যকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়, পোশাক ছাড়া,

ব্র্যান্ড ছাড়া, তার চারপাশে কেউ যে গল্প গড়ে তুলেছে তা ছাড়া। এটা হয়তো পুরো শিল্পব্যবস্থার নিজেকে স্বৈচ্ছায় দেওয়া একমাত্র সত্যের মুহূর্ত — আর এটা কাকতালীয় নয় যে এর আয়োজন হয় একটা পরীক্ষাগারে, নিয়ন্ত্রিত চলরাশি নিয়ে, যেন সত্য এত বিপজ্জনক যে তাকে বাস্তব জগতে ছেড়ে রাখা যায় না।

ব্লাইন্ড টেস্ট যে তার ফরমায়েশ দেয়, তাকে একটা অস্বস্তিকর কথা বলে: কখনও কখনও সেরা পণ্য সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া পণ্য নয়, আর সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়াটা সেরা নয়। টেস্টের অন্ধকারে টের পাওয়া স্বাদ, অনুভূতি, মান প্রায়ই দিনের আলোয় বিক্রির তালিকার সঙ্গে মেলে না। চোখ বন্ধ করে আমরা যা বেছে নিতাম আর চোখ খুলে যা কিনি, তার মধ্যকার এই ফাঁক ঠিক এই মাপটা দেয়, ব্র্যান্ড, পোশাক, গল্প জিনিসটার নিজের থেকে কতটা বেশি ভারী।

তারপর আসে দাম। দামের হওয়ার কথা মূল্যের এক সৎ অনুবাদ, সবার মানা একটা সংখ্যায়। কিন্তু দাম, প্রায় সবসময়, মূল্য মাপে না: সে মাপে মানুষ কতটা বিশ্বাস করতে রাজি যে সেই মূল্য আছে। একই ব্লাইন্ড টেস্ট থেকে সমান হয়ে বেরোনো দুটো পণ্যের দাম হতে পারে একেবারে আলাদা, আর সেই ফাঁক তোমাকে মানের কোনো তফাতের কথা বলে না — বলে গল্পের এক তফাতের কথা। দাম, এই অর্থে, কখনও গাণিতিক সত্য নয়। এটা সংখ্যায় পরিণত এক বিশ্বাসের কাজ।

আর শেষে বাজার, সেই জায়গা যেখানে এই সবকিছু মিশে যায় আর এক হিসেবে বিচার হয়: পণ্য, ব্র্যান্ড, দাম, ধারণা। বাজার অবশ্যই সেরাটাকে পুরস্কার দেয় না। সে পুরস্কার দেয় তাকে, যে নিজেকে বেছে নেওয়াতে পারে, যা অন্য জিনিস, কখনও কখনও উল্টো। একটা উদ্যোগের হাতে তার খাতের সবচেয়ে সৎ পণ্য থাকতে পারে, আর তবু সে হেরে যেতে পারে এমন এক প্রতিযোগীর কাছে, যে শুধু আরও বিশ্বাসযোগ্য একটা গল্প বলেছে। বাজার মানের কোনো নিরপেক্ষ বিচারক নয়: সে এক সমষ্টিগত আয়না, যা দেখায় মানুষ, সব মিলিয়ে, সারবস্তু আর গল্পকে আলাদা করতে কতটা জানে বা জানে না।

যে মানুষ এই যন্ত্রের ভেতরে অনেক দিন কাজ করেছে, সে এমন এক জ্ঞান বয়ে বেড়ায় যা প্রায় একটা বোঝা: সে জানে, ব্লাইন্ড টেস্ট সত্যি

বলে, দাম বলে একটা বিশ্বাসের কথা, আর বাজার শুধু বলে কে জিতেছে — কখনও বলে না কে ঠিক ছিল। এই তফাত নিয়ে বেঁচে থাকা, আর তবুও বিশ্বাস রাখা যে সৎ পণ্যেরই জেতার অধিকার আছে — এটাই হয়তো আদর্শবাদের শেষ রূপ, যা বেঁচে আছে তাদের জন্য, যারা ব্যবস্থাটাকে ভেতর থেকে দেখেছে।

বিজ্ঞাপন, লক্ষ্য, বাজেট

প্রতি বছর, কোম্পানির ক্যালেন্ডারের কোনো এক অনুমেয় মুহূর্তে, কেউ একজন একটা ঘরে বসে ঠিক করে, মনে থেকে যাওয়ার দাম কত হবে।

শেষ পর্যন্ত, বিজ্ঞাপনের বাজেটের আসল মানে এটাই: এটা কোনো পণ্যের খরচ নয়, এটা সেই দাম যা দেওয়া হয় এমন একজনের মনে উপস্থিত থাকার জন্য, যে কখনও এ নিয়ে ভাবতে চায়নি। বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার জন্ম হয় বিজ্ঞান হিসেবে — চার্ট, পেনিট্রেশনের রেখা, এক্সপোজারের আদর্শ ঘনত্ব — কিন্তু তার গভীরতম সারবস্তুতে এটা সংগঠিত নাছোড়বান্দাপনার একটা কাজ। এটা পদ্ধতি আর টাকা দিয়ে পৃথিবীকে অনুরোধ করে এমন একটা ভাবনার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে, যা না হলে কখনও জন্মাতই না।

সেই বাজেটের সঙ্গে জোড়া লক্ষ্যগুলো প্রায় সবসময় একই চেহারা নেয়: বৃদ্ধির শতাংশ, দখল করার মতো বাজারের অংশ, নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের মধ্যে গড়ে তোলার মতো পরিচিতি। এগুলো বৈধ লক্ষ্য, মাপা যায়, মিটিংয়ে সমর্থন করা যায়। কিন্তু এগুলো প্রায় সবসময় সেই প্রশ্ন থেকে অনাথ, যে প্রশ্ন এদের আগে আসা উচিত: কীসের তুলনায় বৃদ্ধি, কোথায় পৌঁছতে, কার সেবায়। সংখ্যাটা নিজেই হয়ে ওঠে লক্ষ্য। কেন সেই সংখ্যার গুরুত্ব থাকা উচিত, সেই কারণটা হারিয়ে যায়, ত্রৈমাসিকের পর ত্রৈমাসিক, তাকে ছোঁয়ার দৌড়ে।

শেষে, বাজেটই একটা প্রতিষ্ঠানের আসল অগ্রাধিকারের সবচেয়ে সৎ প্রমাণ — দেয়ালে ছাপানো যে-কোনো মিশন স্টেটমেন্টের চেয়ে বেশি সৎ। প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ নিয়ে তুমি যে বাক্য খুশি লিখতে পারো, কিন্তু টাকা কোথায় যায়, সেটাই সত্যিই বলে দেয় কী গুরুত্বপূর্ণ। যে প্রতিষ্ঠান বলে সে পণ্যে বিশ্বাস করে, অথচ বাজেটের বেশির ভাগ খরচ করে

পণ্যটাকে যা সে আসলে তার থেকে আলাদা দেখাতে, সে না চেয়েও উত্তর দিয়ে ফেলেছে সেই প্রশ্নের, যা কেউ তাকে সরাসরি করেনি: তুমি আসলে কীসে বিশ্বাস করো।

এই মিটিংগুলোতে একটা প্রশ্ন কদাচিৎ করা হয়, আর হয়তো সেটাই একমাত্র প্রশ্ন যার গুরুত্ব আছে: আমরা যা প্রতিশ্রুতি দিই, পণ্যটা যদি সত্যিই তাই হত, তাহলে তাকে চেনাতে কি এত খরচ করতে হত? বিজ্ঞাপন, তার বিশুদ্ধতম রূপে, শুধু এমন এক মূল্যের প্রতিধ্বনি হওয়া উচিত যা আগে থেকেই আছে। অথচ প্রায়ই সে হয়ে ওঠে এমন এক মূল্যের জন্য প্রতিধ্বনি বানানোর চেষ্টা, যা এখনও নিজে থেকে কোনো শব্দই করেনি।

যে বছরের পর বছর বাজেট পরিকল্পনা করেছে, সে জানে প্রতিটি সংখ্যার পেছনে লুকিয়ে থাকে একটা নীরব বাজি: যে কোনো কথা যথেষ্টবার, যথেষ্ট মানুষকে বললে সেটা সত্যি হয়ে যাবে। কখনও কখনও কাজ হয়। কিন্তু পণ্যটা সত্যিই যোগ্য না হয়েও যখন কাজ হয়, সেই সাফল্য প্রতিষ্ঠানের জয় নয়। সেটা শুধু প্রমাণ যে মানুষের ইচ্ছা, যথেষ্ট নাছোড়ভাবে প্রয়োগ করলে, যে-কাউকে যা-খুশি বিশ্বাস করাতে পারে — এমনকি নিজেকেও।

বিক্রি, লঞ্চ, প্রি-অর্ডার

পণ্যটা দোকানের তাকে সত্যিই হাজির হওয়ার আগেই একটা সংখ্যা তৈরি হয়ে থাকে: তার কতটা বিক্রি হবে। এই অর্থে বিক্রির পরিকল্পনা বিজ্ঞানের পোশাক পরা একটা বিশ্বাসের কাজ — ভবিষ্যৎকে এমনভাবে আঁকা হয় যেন তা আগেই ঘটে গেছে, আর বছরের বাকিটা কাটে বাস্তবকে সেই পূর্বাভাসের সঙ্গে মেলানোর চেষ্টায়, সেটাকে সত্যি করতে যা লাগে তাই করে।

লঞ্চ হল সেই মুহূর্ত, যখন এই বিশ্বাস প্রকাশ্য হয়ে ওঠে। এটা এমন একটা দিন, যা গড়া হয় একটা অনুষ্ঠান গড়ার মতো যত্নে — কারণ সারবস্তুতে এটা অনুষ্ঠানই: একটা সমষ্টিগত আচার, যেখানে প্রতিষ্ঠান পৃথিবীকে ঘোষণা করে যে নতুন কিছু গ্রহণ করার জন্য তৈরি। কিন্তু লঞ্চের আলোর পেছনে প্রায় সবসময় থাকে একটা পুরনো, কম বলার

মতো উদ্বোধন: জনগণ সাড়া দেওয়ার আগেই জানতে চাওয়া, মাস কয়েক আগে একটা বন্ধ ঘরে যে সংখ্যার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল, প্রথম আসল সপ্তাহগুলোতে তা টিকবে, না ভেঙে পড়বে।

তারপর প্রি-অর্ডার — প্রথম আসল সংখ্যা, প্রকৃত বিক্রির আগে, পণ্যটা যে সত্যিই পাবে তার হাত ছোঁয়ার আগেই। প্রি-অর্ডার হল খুব তাড়াতাড়ি মাপা নাড়ি: তা বলে অভিজ্ঞতার আগে কতটা আকাঙ্ক্ষা আছে, পরে কতটা মূল্য থাকবে তা নয়। একটা প্রতিষ্ঠান বিপুল সংখ্যক প্রি-অর্ডার উদ্‌যাপন করতে পারে, আর মাস কয়েক পরে আবিষ্কার করতে পারে যে আকাঙ্ক্ষাটা আসল জিনিসের সংস্পর্শে টেকেনি। উল্টোটাও, আরও কম ক্ষেত্রে, ঠিক ততটাই সত্যি: নীরবে জন্মানো পণ্য, তাদের সমর্থনে কোনো প্রি-অর্ডার ছাড়াই, যারা পরে নিজে থেকে, ধীরে ধীরে, এমন এক আস্থা পেয়েছে যা কোনো সেলস অফিস কখনও পূর্বাভাস করেনি।

এই পুরো যন্ত্রে গভীরভাবে মানবিক, আর একই সঙ্গে গভীরভাবে নিষ্ঠুর কিছু একটা আছে: একটা সংখ্যার কাছে চাওয়া হয় এমন মানুষের আকাঙ্ক্ষা আগাম জানিয়ে দিতে, যারা জিনিসটার সঙ্গে এখনও দেখাই করেনি। স্বাগত জানানোর পরিকল্পনা হয়, স্বাগত জানানোর মতো কিছু থাকবে কিনা জানার আগেই। আর সংখ্যা যখন মেলে না, দোষটা কদাচিৎ পড়ে যে পূর্বাভাস দিয়েছিল তার ঘাড়ে — পড়ে যে উৎপাদন করেছিল তার ঘাড়ে, যে প্রচার করেছিল তার ঘাড়ে, যে আসল জিনিসের বেশি কাছে আর স্প্রেডশিটের বেশি দূরে ছিল তার ঘাড়ে।

যে যথেষ্ট লক্ষ্য পার করেছে তাদের ছন্দ চেনার মতো, সে জানে লক্ষ্যের দিনটা কখনও সত্যের দিন নয়। এটা শুধু প্রথম দিন, যেদিন পূর্বাভাস ধীরে ধীরে মানুষ আসলে কী চায় তার মুখোমুখি হতে শুরু করে — এমন এক সাক্ষাৎ, যার জায়গা কোনো বাজেট, কোনো পরিকল্পনা, কোনো প্রি-অর্ডারের সংখ্যা কখনও সত্যিই নিতে পারে না।

ট্রান্সফার প্রাইস, মুনাফা, অপারেটিং মার্জিন

ট্রান্সফার প্রাইস হল পুরো শৃঙ্খলের প্রথম সৎ সংখ্যা, আর সবচেয়ে লুকনোও। এটা সেই টাকা যা প্রতিষ্ঠান তার পরিবেশককে বেচা প্রতিটি ইউনিটের জন্য আসলে পায়, খুচরো দাম মার্কআপ, অন্যের মার্জিন

আর বানানো ধারণায় ফুলে ওঠার আগে। এটা সেই সংখ্যা যা কোনো বিজ্ঞাপন কখনও দেখাবে না, কারণ এটা কোনো স্বপ্নের কথা বলে না: এটা বলে একটা খরচের কথা, তার সঙ্গে একটা মার্জিন, তার সঙ্গে একটা কাঠামোর টিকে থাকা।

মুনাফা হল সেই সংখ্যার যা বাকি থাকে বাকি সব কিছু মেটানোর পরে — মানুষ, কাঁচামাল, ভাড়া, যন্ত্র, সুদ, কর। মুনাফা নিজে ভালোও নয়, খারাপও নয়: এটা শুধু প্রমাণ যে একটা সংগঠন যা আয় করেছে তার চেয়ে কম খরচ করেছে, আর আরও একটা বছর টিকে গেছে। সমস্যা কখনও মুনাফা নিজে নয়। সমস্যা শুরু হয় যখন মুনাফা একটা ভালোভাবে তৈরি পণ্যের ফল হওয়া থামিয়ে দেয় এবং হয়ে ওঠে একমাত্র লক্ষ্য, যা উজানের প্রতিটি সিদ্ধান্তকে ন্যায্য করে — এমনকি সেগুলোকেও, যার দাম পণ্য, বা যারা পণ্য বানায় তারা, নীরবে মেটায়।

অপারেটিং মার্জিন হল এই পুরো আলোচনার সবচেয়ে ঠান্ডা আর সবচেয়ে সং রূপ: একটা শতাংশ, ত্রৈমাসিকের পর ত্রৈমাসিক হিসেব করা, যা বলে একটা প্রতিষ্ঠান কতটা দক্ষভাবে আয়কে মুনাফায় বদলায়। বিশ্লেষকরা অন্য সব কিছুর আগে এই সংখ্যাটাই দেখেন, কারণ এটা উদ্দেশ্য নিয়ে মিথ্যে বলে না — এটা শুধু ফল মাপে। কিন্তু ঠিক এই কারণেই অপারেটিং মার্জিন হয়ে উঠতে পারে সবচেয়ে নীরব অত্যাচার: একটা শতাংশ, যাকে রক্ষা করতে হবে ত্রৈমাসিকের পর ত্রৈমাসিক, এমনকি যখন তাকে রক্ষা করার মানে সেই সব কাটছাঁট করা যা সংখ্যায় তখনই দেখা যায় না — গুণমান, রক্ষণাবেক্ষণ, মানুষ, সেই সময় যা একটা পণ্যকে তাড়াতাড়ি নয়, ভালোভাবে বানাতে লাগত।

একটা প্রশ্ন আছে যা এই তিনটে সংখ্যা, একসঙ্গে নিলে, কখনও করে না: যে মার্জিন আমরা রক্ষা করছি — তা কি রক্ষা করছি যা করার জন্য আমাদের জন্ম, সেটা করে যেতে, নাকি শুধু একটা কাঠামো হিসেবে টিকে থাকতে? এ দুটো আলাদা উত্তর, আর দ্বিতীয়টা, যখন কেউ টের না পেয়েই জিতে যায়, তখন তা এই বই যে নীরব সংকটের কথা বলে তার শেষ ধাপ: এমন এক প্রতিষ্ঠান, যে কেন আছে তা জিজ্ঞেস করা থামিয়ে দিয়েছে, আর ত্রৈমাসিকের পর ত্রৈমাসিক শুধু রক্ষা করে চলে টিকে থাকার অধিকারটুকু।

যে এই সংখ্যাগুলো বছরের পর বছর কাছ থেকে দেখেছে, সে এমন কিছু জানে যা কদাচিৎ জোরে বলা হয়: ট্রান্সফার প্রাইস, মুনাফা, অপারেটিং মার্জিন সবসময় একটা কাঠামোর স্বাস্থ্যের কথা বলে। নিজে থেকে কখনও বলে না, সেই কাঠামো এখনও যে কারণে তার জন্ম সেই কারণের সেবা করছে কিনা। সেই উত্তর কোনো ব্যালান্স শিটে লেখা নেই। তাকে খুঁজতে হয় অন্য কোথাও — সেই মানুষদের মধ্যে, যারা তা মনে রাখার মতো যথেষ্ট দিন থেকে যায়, আর তা বলার মতো যথেষ্ট সং।

কারখানা আর আগেই বিক্রি হয়ে যাওয়া জিনিসের উৎপাদন

এমন একটা তফাত আছে যা প্রতিষ্ঠানের বাইরের খুব কম মানুষ জানে, আর ভেতরে যে কাজ করে সে তা তাড়াতাড়ি আর নিজের খরচে শেখে: যা দরকার তা উৎপাদন হয় না, উৎপাদন হয় যা আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। কারখানা কোনো প্রয়োজনের পেছনে ছোটে না। সে ছোট্ট আগেই সই হয়ে যাওয়া একটা অর্ডারের পেছনে, একজন খদ্দের, একজন পরিবেশক, একটা বাজারকে আগেই প্রতিশ্রুত একটা সংখ্যার পেছনে, যে প্রথম ইউনিট তৈরি হওয়ার আগেই হ্যাঁ বলে দিয়েছে।

এটা নীরবে উৎপাদনের মানেরটাই উল্টে দেয়। পণ্য, যা তার উৎসে ছিল একটা কল্পিত প্রয়োজনের উত্তর, কারখানায় এসে হয়ে যায় আগেই বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা চুক্তির যান্ত্রিক ফল। প্রতিটি শিফট, প্রতিটি লাইন, প্রতিটি সাপ্তাহিক পরিকল্পনাকে যে প্রশ্ন চালায়, তা আর “পৃথিবীর কী দরকার” নয়, বরং “আমরা কতটা ডেলিভারির প্রতিশ্রুতি আগেই দিয়ে ফেলেছি।” অন্য কিছু জিজ্ঞেস করার সময়ও কারখানার নেই, এখতিয়ারও নেই।

আর এই যন্ত্রের ভেতরে, আগেই বিক্রি হয়ে যাওয়া জিনিসের উৎপাদন হয়ে ওঠে এক চিরন্তন ধাওয়া: উৎপাদন হয় যা আগেই বিক্রি হয়েছে তার মর্যাদা রাখতে, আর আরও বেশি বিক্রি হয় কারণ কারখানা একবার চালু হলে নিজেকে ন্যায্য প্রমাণ করতে তাকে চলতেই হবে। একটা বসে থাকা লাইনের খরচ একটা উৎপাদনশীল লাইনের মতোই — প্রায়ই তার চেয়ে বেশি — আর এটা একটা নীরব চাপ তৈরি করে, যা কোনো সরকারি

নথিতে কখনও লেখা থাকে না: বিক্রি করো, পৃথিবীর দরকার বলে নয়, কারখানার উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া দরকার বলে।

এখানেই পণ্য তার দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতকতার ঝুঁকিতে পড়ে, এই পাতাগুলোর অন্য জায়গায় বলা প্রথমটার পরে: একটা আসল প্রয়োজনের উত্তর দেওয়াই আর যথেষ্ট নয়। তাকে সবার আগে উত্তর দিতে হবে কারখানা চালু রাখার প্রয়োজনের কাছে। যে বছরের পর বছর এই ব্যবস্থার ভেতরে কাজ করে, সে চিনতে শেখে সেই মুহূর্ত, যখন জিনিসের ক্রম উল্টে গিয়েছিল — যখন আর কিছু কাজের জিনিস বানানো হয়েছে বলে বিক্রি হয় না, বরং কিছু বানানো হয় কারণ এমন কিছু আগেই বিক্রি হয়ে গেছে যা ডেলিভারি না দেওয়ার সামর্থ্য কাঠামোটোর এখন আর নেই।

এটা কারখানার নিজের বিরুদ্ধে কোনো রায় নয়। কারখানা, একা নিলে, শুধু হুকুম মানা একটা শরীর। বিশ্বাসঘাতকতা, যখন ঘটে, ঘটে আরও উজানে — যে ঠিক করে কতটা বিক্রি হবে আর যে কারখানায় সেই সিদ্ধান্তকে ঘণ্টা, উপকরণ, শিফট, আসল মানুষের আসল ক্লাস্তিতে অনুবাদ করে, তাদের মধ্যে বেড়ে চলা দূরত্বে। বিক্রি হওয়া সংখ্যাটা সবসময় আসে ওপর থেকে হুকুম হয়ে। তাকে উৎপাদন করার মানবিক দাম কিন্তু সবসময় থেকে যায় নিচে — যেখানে কোনো সেলস চার্ট তাকে কখনও দেখায় না।

বিক্রি, খরচ ও সুবিধা

প্রতি মাসে, প্রতিটি আত্মসম্মানী প্রতিষ্ঠানে, কেউ একজন সেই একই স্প্রেডশিট আবার খোলে আর দুটো কলাম মিলিয়ে দেখে: কী এল, কী গেল। এই আচার এত বার পুনরাবৃত্ত যে নিরপেক্ষ মনে হয়, প্রায় বৈজ্ঞানিক। কিন্তু সেই তুলনার ভেতরে লুকিয়ে থাকে যে-কোনো সংগঠনের সবচেয়ে নীরব আর সবচেয়ে নির্ণায়ক একটা পছন্দ: কোনটাকে খরচ হিসেবে গোনা হবে, আর কোনটাকে লাভ হিসেবে।

বিক্রির বিশ্লেষণ নিখুঁতভাবে বলে কী নড়েছে: কত ইউনিট, কাকে, কোথায়, কখন। ওপরে ওপরে এটা সৎ তথ্য — ব্যাখ্যার কোনো জায়গা রাখে না, সংখ্যা যা, তাই। কিন্তু যে সততা তথ্যটাকে নির্ভরযোগ্য করে,

সেটাই তাকে অন্ধও করে: বিক্রির বিশ্লেষণ কখনও আলাদা করে না, কে আসল প্রয়োজনে কিনেছে আর কে অভ্যাসে, কে ফিরে আসবে আর কে কখনও আসবে না, কোন খন্দেরকে সত্যিই জয় করা গেছে আর কোন খন্দের শুধু এখনও হতাশ হয়নি।

তারপর আসে খরচ-লাভের বিশ্লেষণ, যে প্রতিশ্রুতি দেয় পুরো প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে যুক্তিনিষ্ঠ ঘর হওয়ার — সেই জায়গা, যেখানে প্রতিটি সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত তুলনীয় সংখ্যার মধ্যে একটা তুলনায় নেমে আসে। কিন্তু এই যুক্তিনিষ্ঠতা লুকিয়ে রাখে একটা আগের পছন্দ, যা নিয়ে প্রায় কখনও খোলাখুলি আলোচনা হয় না: কে ঠিক করে কোনটা খরচের কলামে যাবে আর কোনটা লাভের কলামে। একজন মানুষের সময়কে খরচ হিসেবে গোনা যায়। তার মানসিক চাপকে, প্রায় কখনও না। দীর্ঘমেয়াদি সুনামের ক্ষতিকে হারানো লাভ হিসেবে গোনা যায়। সেটা ঠেকিয়ে যে মানবিক ক্ষয় এড়ানো গেল, তাকে প্রায় কখনও না। বিশ্লেষণটা নিরপেক্ষ মনে হয় কারণ সে সংখ্যা ব্যবহার করে, কিন্তু সংখ্যাগুলো মাপে শুধু সেটুকুই, যা কেউ আগে থেকে মাপার যোগ্য বলে ঠিক করে দিয়েছে।

এটাই প্রতিটি কোম্পানি-পরিকল্পনার সবচেয়ে বিপজ্জনক অন্ধ বিন্দু: তুমি এমন একটা বিশ্লেষণ বানাতে পারো যা পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত, ভেতরে ভেতরে সুসংগত, যে-কোনো পরিচালনা পর্ষদের সামনে সমর্থনযোগ্য — আর তবুও শুরু থেকেই বাদ দিয়ে ফেলেছ সবচেয়ে জরুরি চলকটাকে, শুধু এই কারণে যে স্প্রেডশিটে সেই চলকের জন্য কোনো তৈরি ঘর ছিল না। একটা সিদ্ধান্তের মানবিক দাম, প্রতিশ্রুতি রাখার লাভ এমনকি যখন তা আর লাভজনক নয়, বছরের পর বছর গড়ে ওঠা আর এক ত্রৈমাসিকে ভেঙে যাওয়া একটা সম্পর্কের মূল্য: এর কোনোটাই সহজে একটা কলামে আঁটে না। আর যা একটা কলামে আঁটে না, অনেক প্রতিষ্ঠানে, তার কোনো অস্তিত্বই নেই।

যে বছরের পর বছর এই বিশ্লেষণ করেছে, সে জানে শেষ সংখ্যাটা, যত কঠোরই হোক, সবসময় একটা আংশিক গল্প বলে — মিথ্যে বলে নয়, বরং এই কারণে যে গোনা শুরু হওয়ার আগেই সে ঠিক করে ফেলেছে কী গোনার যোগ্য। আসল খরচ-লাভের বিশ্লেষণ, যা কোনো স্প্রেডশিট

নিজে থেকে করতে পারে না, তা হল জিজ্ঞেস করা: তুমি কী না দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছ, আর কেন।

ফলাফল ও মুনাফা

ক্যালেন্ডারে সবসময় একটা নির্দিষ্ট দিন থাকে, যেদিন ফলাফল জোরে পড়ে শোনানো হয়। একটা ঘর, একটা পর্দা, পর্দায় ফেলা কয়েকটা সংখ্যা, যারা কয়েক মিনিটে ঠিক করে দেয় বছরটা সাফল্য না ব্যর্থতা — সেই সংখ্যা যে বারো মাসের সারাংশ, তাতে আসলে যা কিছু ঘটেছিল তার তোয়াক্কা না করেই।

বিক্রির ফলাফলের এমন একটা ক্ষমতা আছে যা কোম্পানির আর কোনো সংখ্যার নেই: তারা প্রেক্ষাপট মুছে দেয়। তারা বলে না একজন মানুষ কত বার এমন সমস্যার সমাধান করেছে যা কোনো রিপোর্ট কখনও মাপবে না, বলে না সেই খদ্দেরের কথা যে একটা ভুল সত্ত্বেও বিশ্বস্ত থেকে গেছে, বলে না বছর কয়েক আগে দেওয়া একটা প্রতিশ্রুতি না ভাঙার জন্য করা পরিশ্রমের কথা। তারা শুধু বলে সংখ্যাটা অন্য একটা সংখ্যার তুলনায় বেড়েছে না কমেছে — গত বছরের, বা বাজেটের। বাকি সব, যত সত্যিই হোক, যত মানবিকই হোক, স্লাইডে কখনও আসে না।

তারপর মুনাফা, ঠিক পরেই পড়া হয়, যা এই সব কিছুর সারসংক্ষেপ হওয়ার কথা — কিন্তু আসলে তা শুধু মাস কয়েক আগে নেওয়া হাজারটা সিদ্ধান্তের শেষ প্রতিধ্বনি, কিছু ভালো, কিছু খারাপ, কিছু ভুল কারণে ঠিক আর কিছু ঠিক কারণে ভুল। বার্ষিক মুনাফার কর্তৃত্ব একটা রায়ের মতো, আর অন্ধত্বও একটা রায়ের মতো: সে ফল বিচার করে, পথ নয়। একটা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার বছর দারুণ হতে পারে এমন সব পছন্দের ওপর, যার দাম তিন বছরে চড়া হয়ে মেটাতে হবে, আর হতাশাজনক মুনাফার বছর হতে পারে এমন সব পছন্দের ওপর, যা এমন মূল্য দেবে যা কেউ এখনও চিনতে জানবে না।

এই দুটো সংখ্যার — বিক্রি আর মুনাফার — জন্য প্রতি বছর যেভাবে অপেক্ষা করা হয়, তাতে প্রায় ধর্মীয় কিছু আছে: এরা শেষ বিচার, সেই রায় যা একটা গোটা সংগঠনকে খালাস দেয় বা দণ্ড দেয়, প্রায়ই এই

তোয়াক্কা না করে যে সদ্য শেষ হওয়া বছরটা জুড়ে কতটা সৎ কাজ, কতটা আসল পরিশ্রম, প্রতিষ্ঠার কারণের প্রতি কতটা নিষ্ঠা বয়ে গেছে। যে প্রতিষ্ঠান নীরবে নিজের উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সে দারুণ ফলাফল দেখাতে পারে। যে প্রতিষ্ঠান তার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে, সে হতাশাজনক ফলাফল দেখাতে পারে। সংখ্যা একা কখনও দুটোকে আলাদা করে না।

যে বছরের পর বছর, ঘরের পর ঘর, এই ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করেছে, সে জানে যেদিন সেগুলো পড়া হয়, সেদিন কখনও একটা প্রতিষ্ঠানের সত্য আবিষ্কার হয় না। সেদিন শুধু আবিষ্কার হয়, সেই সত্য, যা-ই হোক, কতটা এমন একটা সংখ্যায় বদলায় যা সবাই একইভাবে পড়তে পারে — এমনকি যখন সেই সংখ্যা, নিজে থেকে, কখনও বলতে পারেনি একমাত্র কথাটা যার সত্যিই গুরুত্ব আছে: প্রতিষ্ঠানটা এখনও তাই করছে কিনা, যা করার জন্য তার জন্ম।

মুনাফা, শেয়ারহোল্ডার ও ডিভিডেন্ড

প্রতিটি শৃঙ্খলের শেষে — পণ্য, কারখানা, বিক্রি, মুনাফা — আসে সেই মুহূর্ত, যখন আয় ভাগ করা হয়। সবটা খরচ হয় না, সবটা আবার বিনিয়োগ হয় না: একটা অংশ ফেরত যায় যে মূলধন জুগিয়েছিল তার কাছে, ডিভিডেন্ডের রূপে। এটা শৃঙ্খলের শেষ আংটা, আর একই সঙ্গে সবচেয়ে নীরব, কারণ বোর্ডরুমের বাইরে প্রায় কেউই সত্যিই জানে না সেই সংখ্যায় কীভাবে পৌঁছানো হয়।

ডিভিডেন্ড, তার বিশুদ্ধতম রূপে, হওয়ার কথা সংখ্যায় দেওয়া একটা ধন্যবাদ: কেউ একটা উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করেছিল তা ফল দেওয়ার আগেই, কোনো নিশ্চয়তা ছাড়াই টাকা ঝুঁকিতে রেখেছিল, আর এখন সেই উদ্দেশ্য যা তৈরি করেছে তার একটা ভাগ পায়। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য আর আজকের ডিভিডেন্ডের মধ্যে, প্রায়ই, আর কোনো সরাসরি সুতো থাকে না। যে শেয়ারহোল্ডার চেক ভাঙায়, সে হয়তো কখনও জানেনি, বা জানতে চায়নি, প্রতিষ্ঠানটা কেন জন্মেছিল। সে একটা অংশ কিনেছে, একটা গল্প নয়। সে গাছটাকে কখনও না চিনেই একটা ফল পায়।

এটা এমন এক দূরত্ব তৈরি করে যা কোনো ব্যালান্স শিট লিপিবদ্ধ করে না: যে আয় তৈরি করতে খাটে আর যে কখনও কারখানা, পরিশ্রম, প্রতিষ্ঠার কারণের প্রতি রোজকার নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে না হেঁটেই তা পায়, তাদের মধ্যের দূরত্ব। এটা নিজে অন্যায্য নয় — মূলধনের সময়ের সঙ্গে এই চুক্তি চিরকালের: আজ ঝুঁকি নেয়, কাল আদায় করে, এমনকি যে কাল সে সম্ভব করেছে তাতে উপস্থিত না থেকেও। কিন্তু এটা এমন এক চুক্তি যা দশকের পর দশক পুনরাবৃত্ত হয়ে, শেয়ারহোল্ডারদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, যারা কখনও প্রশ্নটা না করেই একে অন্যের জায়গা নেয়, শেষে আয়কে তার মূল অর্থ থেকে ফাঁপা করে দেয়। তা হয়ে যায় একটা বাঁধা আয়। আর বাঁধা আয়, সংজ্ঞা অনুযায়ীই, আর কেন জিজ্ঞেস করে না — শুধু জিজ্ঞেস করে কত, আর কখন।

আর তবুও ঠিক এখানেই, শৃঙ্খলের এই প্রায় ভুলে যাওয়া বিন্দুতেই, বইটি ফিরে আসতে চায়। ডিভিডেন্ড যে পায় তাকে এই অভিযোগ করতে নয় যে সে যা পায় তার যোগ্য নয়। বরং তাকে মনে করিয়ে দিতে — তাকেই, আর সবার আগে — যে সেই সংখ্যার পেছনে এখনও, কোথাও, একটা মানুষের ইচ্ছা আছে, যে একটা নির্দিষ্ট কারণে একটা জিনিসের অস্তিত্ব চেয়েছিল। যে শেয়ারহোল্ডার জমা পড়া সংখ্যার দিকে শুধু তাকানোর আগে এক মুহূর্ত থেমে জিজ্ঞেস করত সেই কারণটা কী ছিল, সে এমন কিছু করত যা কোনো বার্ষিক সভা কখনও সত্যিই তার কাছে চায়নি: সে আবার একজন মানুষ হয়ে উঠত, শুধু শেয়ারের মালিক নয়।

শেষ পর্যন্ত, এটাই এই বইয়ের শেষ ঠিকানা। যে কর্মীরা কাজ সম্পাদন করে তারা নয়, যে কর্তারা পরিচালনা করে তারা নয় — বরং যে কাগজে-কলমে সেই উদ্দেশ্যের মালিক, যার জন্য এই সব শুরু হয়েছিল। তাদের কাছেই, আর সবার চেয়ে বেশি, সেই প্রশ্ন, যার উত্তর কোনো ডিভিডেন্ড নিজে থেকে কখনও দিতে পারে না: আমি কি এখনও সেই কারণের সেবা করছি যার জন্য এই জিনিসটার জন্ম, নাকি শুধু তার ফলনের?

ত্রৈমাসিক রিপোর্ট

প্রতি তিন মাসে, একটা প্রতিষ্ঠান থামে আর নিজের গল্প বলে। মুক্ত শব্দে নয়, বরং একটা নির্দিষ্ট ছাঁচের ভেতরে, যা পাবলিক বাজারের কাছে

দায়বদ্ধ পৃথিবীর প্রতিটি কোম্পানির জন্য এক: আয়, খরচ, মার্জিন, পরের ত্রৈমাসিকের পূর্বাভাস। আচারটা এত সংক্ষিপ্ত — কয়েক সপ্তাহের প্রস্তুতি, এক ঘণ্টার উপস্থাপনা — যে প্রায় নিরীহ মনে হয়। কিন্তু হয়তো এই আচারটাই, আর সবার চেয়ে বেশি, বদলে দিয়েছে একটা প্রতিষ্ঠান সময়ের সঙ্গে নিজেকে কীভাবে ভাবে।

এই বাধ্যবাধকতা আসার আগে, একটা ব্যবসা নিজেকে দশকে ভাবতে পারত। একজন প্রতিষ্ঠাতা জেনেশুনে একটা বীজ পুঁততে পারতেন যে তা দশ বছরে ফল দেবে, আর কেউ তাঁকে প্রতি তিন মাসে জিজ্ঞেস করত না সেটা কতটা বেড়েছে। ত্রৈমাসিক রিপোর্ট কোম্পানির সময় মাপার একক বদলে দিয়েছে: বছর থেকে মাসে, প্রকল্প থেকে চক্রে, দূরদৃষ্টি থেকে সঙ্গে সঙ্গে যাচাইযোগ্য পূর্বাভাসে। এটা নিরপেক্ষ বদল নয়। এটা সেই পদ্ধতিরই রূপান্তর, যে পদ্ধতিতে একটা মানুষের ইচ্ছাকে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার অনুমতি দেওয়া হয়।

কারণ যে সিদ্ধান্তের আসল ফল দিতে তিন বছর লাগবে, ত্রৈমাসিকের ছন্দের ভেতরে তাকে রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে: যে সিদ্ধান্তটা নেয়, তাকে প্রতি নব্বই দিনে তা ন্যায্য প্রমাণ করতে হয়, মাপা যায় এমন অগ্রগতি দেখাতে হয়, এমনকি যখন সিদ্ধান্তের স্বভাবই চায় ধৈর্য, নীরবতা, এমন সময় যা আর্থিক ক্যালেন্ডার দেয় না। তাই, ধীরে ধীরে, প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু তাই বাছতে শেখে যা পরের রিপোর্টের সময়ের মধ্যে দেখানো যায় — যা সত্যিই দরকার তা অগত্যা নয়, বরং যা তিন মাসের মধ্যে একটা স্লাইডে বলা যায়।

এই অর্থে ত্রৈমাসিক রিপোর্ট শুধু ফলাফল মাপে না: ত্রৈমাসিকের পর ত্রৈমাসিক সে শেখায়, একটা প্রতিষ্ঠান এখনও কোন ধরনের চিন্তা করতে সক্ষম। যে বছরের পর বছর এই ছন্দের ভেতরে বাঁচে, সে নব্বই দিনের জানালায় ভাবতে শেখে, এমনকি তখনও, যখন তার ভেতরের সৎ দিকটা জানে যে কিছু জিনিস — যত্নে তৈরি একটা পণ্য, সময় নিয়ে গড়ে ওঠা খদ্দেরের সঙ্গে একটা সম্পর্ক, প্রতিষ্ঠানটা কেন জন্মেছিল তার স্মৃতি — এক ত্রৈমাসিকে মাপাও যায় না, গড়াও যায় না।

একটা প্রশ্ন আছে যা এই রিপোর্টগুলোয় কদাচিৎ ঢোকে, আর হয়তো এটাই একমাত্র প্রশ্ন যা এই বই তার পাতা থেকে বারবার করে চলে: এই

ত্রৈমাসিকে আমরা কী অন্যভাবে করতাম, যদি কেউ আমাদের কাছে নব্বই দিনে তা প্রমাণ করতে না চাইত? এই প্রশ্নের উত্তর, যা প্রায় সবসময় না-বলা থেকে যায়, একটা প্রতিষ্ঠানের আত্মা সম্পর্কে এমন কথা বলে, যা ইতিমধ্যে প্রকাশিত কোনো সংখ্যা কখনও বলবে না।

ম্যানেজমেন্ট

ম্যানেজমেন্ট জন্মায় একটা কারিগরি শব্দ হিসেবে, আর প্রায় কারও নজরে না পড়েই হয়ে ওঠে আলাদা এক শ্রেণি। এটা আর শুধু পরিচালনার কাজ নয় — সম্পদ গোছানো, মানুষদের সমন্বয় করা, একটা যৌথ উদ্দেশ্যের দিকে সিদ্ধান্ত নেওয়া। এটা হয়ে ওঠে একটা পরিচয়, একটা কেরিয়ার, নিজস্ব এক ভাষা, যা বিশেষ স্কুলে শেখা হয় — যে পণ্য একদিন পরিচালনা করতে হবে, তাকে নিজের হাতে একবারও ছুঁয়ে দেখার আগেই।

এটাই আধুনিক ম্যানেজমেন্টের নিঃশব্দ প্যারাডক্স: যা পরিচালনা করছ, তাকে কখনও না ভালোবেসে, এমনকি সত্যিকারের না চিনেও, তুমি পরিচালনায় অসাধারণ দক্ষ হয়ে উঠতে পারো। একজন ম্যানেজার এক খাত থেকে আরেক খাতে চলে যেতে পারেন — খাদ্য থেকে অর্থনীতি, ফ্যাশন থেকে ওষুধশিল্প — সঙ্গে নিয়ে একই কৌশল, একই স্প্রেডশিট, লক্ষ্য আর সূচকের একই ভাষা, কারণ ম্যানেজমেন্ট তার সবচেয়ে বিশুদ্ধ রূপে নিজেকে বুঝিয়ে ফেলেছে যে সে এক সর্বজনীন বিজ্ঞান, যে-কোনো বিষয়বস্তুর ওপর প্রয়োগযোগ্য, সেই বিষয়বস্তু যারা তা যাপন করে তাদের কাছে কী অর্থ বহন করে, তা নির্বিশেষে।

কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠান কখনও শুধু অপটিমাইজ করার মতো কিছু প্রক্রিয়ার সমষ্টি নয়। এটা এক আদি ইচ্ছা, একটা পণ্যে মূর্ত, এমন মানুষেরা যাকে এগিয়ে নিয়ে যান, যাঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই ইচ্ছা বেছে নেননি — উত্তরাধিকারে পেয়েছেন, কাঁধে তুলে নিয়েছেন, একটা চুক্তিতে সই করে মেনে নিয়েছেন। ম্যানেজমেন্ট যখন এটা ভুলে যায়, তখন সে প্রতিষ্ঠানটা এমনভাবে চালাতে শুরু করে যেন সেটা অন্য যে-কোনোটার সঙ্গে বদলযোগ্য: একই KPI, নেতৃত্বের একই মডেল, একটা ম্যানুয়াল থেকে নকল করা একই পুনর্গঠন, যা অন্য কোথাও কাজ

করেছিল, অন্য প্রেক্ষাপটে, সম্পূর্ণ আলাদা এক প্রতিষ্ঠাকালীন কারণের জন্য।

এই ব্যবস্থায় সবচেয়ে দক্ষ ম্যানেজার সবসময় সেই মানুষটি নন, যিনি প্রতিষ্ঠানের আদি “কেন”-টা সবচেয়ে ভালো বোঝেন। প্রায়ই তিনি সেই মানুষ, যিনি কাঠামোর ভেতরেই সবচেয়ে ভালো চলাফেরা করতে জানেন — একটা মিটিং কীভাবে পড়তে হয়, একটা রাজনৈতিক ঝুঁকি কীভাবে আগে থেকে টের পেতে হয়, একটা ফলাফল কীভাবে সবচেয়ে অনুকূল আলোয় তুলে ধরতে হয়। এগুলো সত্যিকারের দক্ষতা, কখনও কখনও মূল্যবানও। কিন্তু এগুলো কাঠামো নিয়ে দক্ষতা, উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। আর যখন একটা সংগঠন প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাকেই পদোন্নতি দেয়, যে উদ্দেশ্য মনে রাখার চেয়ে কাঠামোর ভেতরে চলাফেরা করতে বেশি জানে, তখন ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠাকালীন ইচ্ছার সেবা করা বন্ধ করে দেয় এবং ধীরে ধীরে তার জায়গা নিতে শুরু করে।

একটা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা আর তার সেবা করার মধ্যে একটা স্পষ্ট তফাত আছে, যা খুব কম মানুষ দেখতে শেখে, যতক্ষণ না কাছ থেকে তা যাপন করে। প্রথমজন যা পায় তাকেই অপটিমাইজ করে। দ্বিতীয়জন কিছু অপটিমাইজ করার আগে সবসময় জিজ্ঞেস করে, যা সে উন্নত করতে চলেছে, তা এখনও সেই কারণের প্রতি বিশ্বস্ত কি না, যার জন্য সবকিছু শুরু হয়েছিল। ম্যানেজমেন্ট, তার শ্রেষ্ঠ রূপে, সবসময় এই দ্বিতীয় জিনিসটাই হওয়া উচিত, কৌশলের পোশাক পরে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে প্রায়ই শুধু কৌশলটাই থেকে যায় — সেই প্রশ্ন থেকে অনাথ হয়ে, যে প্রশ্ন একদিন তাকে প্রয়োজনীয় করে তুলেছিল।

এক্সিকিউটিভ, মাঝারি ম্যানেজার, কর্মীবৃন্দ

প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, একটা নির্দিষ্ট আকার পেরোলে, নিজেকে স্তরে স্তরে সাজায়। শীর্ষে এক্সিকিউটিভরা, যাঁরা দিক ঠিক করেন। মাঝখানে মিডল ম্যানেজাররা, যাঁরা সেই দিককে বাস্তব কাজে অনুবাদ করেন। ভিত্তে কর্মীরা, যাঁরা কাজগুলো সম্পন্ন করেন, অথচ যে দিক থেকে সেগুলো এসেছে, তা প্রায় কখনও পুরোটা দেখতে পান না। এটা একটা দক্ষ পিরামিড, সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার স্কুলগুলো দশকের পর দশক যা নিয়ে

গবেষণা করেছে। কিন্তু এটা নিঃশব্দে এমন এক যন্ত্রণা, যা যে সিদ্ধান্ত নেয় আর যে সেই সিদ্ধান্তের ভার বয়, তাদের মধ্যের দূরত্ব বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

এক্সিকিউটিভ প্রায়ই পণ্যের ভাষা থেকে আলাদা এক ভাষায় বাঁচেন। তিনি কথা বলেন কৌশল নিয়ে, অবস্থান নিয়ে, দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টি নিয়ে — প্রয়োজনীয় সব বর্গ, কিন্তু এমন বর্গ যা বছরের পর বছর বাস্তবের ওপরে ঝুলে থাকতে পারে, কখনও সত্যিই তাকে না ছুঁয়ে। একজন এক্সিকিউটিভ গোটা কেরিয়ার কাটিয়ে দিতে পারেন, নিজের কোম্পানি যে পণ্য বিক্রি করে, তা একবারও হাতে না নিয়ে, যে মানুষ সেটা ব্যবহার করবে, তার সঙ্গে একবারও কথা না বলে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন অন্যদের তৈরি করে দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে, অন্যদের জোগাড় করে দেওয়া সংখ্যার ভিত্তিতে। মাটি থেকে তাঁর দূরত্ব কোনো ব্যক্তিগত দোষ নয়: এটা তিনি যে পদে আছেন, তার স্বাভাবিক পরিণতি।

মিডল ম্যানেজার এই পিরামিডের সবচেয়ে করুণ চরিত্র, কারণ তিনি বাঁচেন ঠিক সর্বোচ্চ টানাপোড়েনের বিন্দুতে: এমন একটা দিককে তাঁকে বাস্তব লক্ষ্যে অনুবাদ করতে হয়, যা প্রায়ই তিনি বেছে নেননি এবং নিয়ন্ত্রণও করেন না, আর তা করতে হয় এমন মানুষদের সামনে — তাঁর নিচের কর্মীরা — যাঁরা অন্য কোথাও নেওয়া প্রতিটি সিদ্ধান্তের দাম দেবেন তাঁদের প্রতিদিনের পরিশ্রমে। মিডল ম্যানেজার দুটো ভাষাই জানেন, কৌশলের ভাষা আর বাস্তবায়নের ভাষা, আর সেজন্যই তিনি সবচেয়ে ভারী বোঝা বয়ে বেড়ান: তিনি জানেন ওপর থেকে কী চাওয়া হচ্ছে, আর জানেন নিচে তা পৌঁছে দিতে সত্যিই কত দাম পড়ে। তিনি বাঁচেন দুটো জগতের মাঝখানে এক সরু করিডোরে, যে দুই জগৎ কদাচিৎ সরাসরি একে অপরের সঙ্গে কথা বলে।

শেষে কর্মী, যিনি প্রতিদিন নিজের হাতে কাজটা ছোঁন — ফোনকল, ফর্ম, উৎপাদন লাইন, অপেক্ষায় থাকা খদ্দের। তিনিই প্রতিষ্ঠানের আসল সারবস্তুর সবচেয়ে কাছের মানুষ, আর একই সঙ্গে তা বদলানোর যে-কোনো ক্ষমতা থেকে সবচেয়ে দূরে। কর্মীরা এমন একটা দিক বাস্তবায়ন করেন, যা ঠিক করেছেন এমন কেউ, যিনি প্রায় নিশ্চিতভাবেই তাঁদের নাম জানেন না। আর সেই দিক যদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকালীন কারণের

সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে থাকে, তবে কর্মীই প্রথম তা আবিষ্কার করেন, প্রতিদিন, যে বাস্তব কাজটা তাঁকে বারবার করতে বলা হয় তার ভেতরে — তা শোধরানোর কোনো সত্যিকারের ক্ষমতা ছাড়াই।

এই পিরামিড — এক্সিকিউটিভ, মিদল ম্যানেজার, কর্মী — ভালোই কাজ করে, যতক্ষণ প্রতিষ্ঠাকালীন কারণটা শীর্ষ থেকে নিচের দিকে অবাধে বয়ে যায় এবং প্রতিটি স্তরকে একটাই যৌথ অভিপ্রায়ের প্রতি বিশ্বস্ত রাখে। কিন্তু যে মুহূর্তে সেই কারণ শীর্ষে দুর্বল হয়ে পড়ে, পিরামিড কাজ করা থামায় না — সে উপাদান করে চলে, সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে, বাস্তবায়ন করে চলে। শুধু তার প্রতিটি স্তরে সে আর জানে না, কেন সে তা করে চলেছে। আর এই বিচ্ছেদ, যখন ঘটে, কখনও নিচ থেকে শুরু হয় না। সবসময় শুরু হয় ওপর থেকে, আর নেমে আসে, স্তরের পর স্তর, যতক্ষণ না তা হয়ে ওঠে সেই মানুষের নীরব বোঝা, যিনি পিরামিডের শেষে কখনও কোনো বিষয়ে কিছু বলার সুযোগ পাননি — একটা জিনিস ছাড়া, যা তাঁর জন্য রয়ে গেছে: যা করেন তাতে বিশ্বাস রেখে চলা, অথবা থেমে যাওয়া।

কর্মচারী ও স্তর

প্রতিটি কর্মচারী, কাজের প্রথম দিনে, একটা কাজ পাওয়ার আগেই কিছু একটা পান: একটা লেভেল। একটা অক্ষর, একটা সংখ্যা, চুক্তির একটা বন্ধনী, যা তিনি নিজের সম্পর্কে একটা শব্দ বলার আগেই বলে দেয় তাঁর এক ঘণ্টার দাম কত, তিনি কতদূর উঠতে পারবেন, সেই কাঠামোর ভেতরে কতদূর যাওয়ার অনুমতি তিনি কোনোদিন পাবেন। এই প্রথম একজন মানুষ স্পষ্ট রূপে সেই ফরম্যাটের মুখোমুখি হন, যার কথা এই বই তার প্রথম পাতা থেকে বলে এসেছে।

লেভেলের একটা অনস্বীকার্য ব্যবহারিক কাজ আছে: সে ক্রম সাজায়, তুলনা করে, হাজার হাজার মানুষের একটা সংগঠনকে প্রতিটি সম্পর্ক শূন্য থেকে দর-কষাকষি না করেই চলতে দেয়। কিন্তু লেভেল, যে মুহূর্তে দেওয়া হয়, এমন কিছু করতে শুরু করে যা কোনো চুক্তি খোলাখুলি বলে না: সে সংজ্ঞায়িত করতে শুরু করে শুধু একজন মানুষ কী করেন তা নয়, কাঠামোর চোখে সেই মানুষটি কী। নিচু লেভেল শুধু বলে না “এই

কাজের মূল্য কম।” সে নিঃশব্দে বলে, “এই মানুষটির গুরুত্ব কম” — এমনকি তখনও, যখন সেই মানুষটি তাঁর প্রতিদিনের পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠাকালীন কারণের প্রতি ঠিক ততটাই বিশ্বস্ততা বয়ে চলেন, যতটা সর্বোচ্চ লেভেলের মানুষটি।

এখানেই কাজের জগতের সবচেয়ে না-বলা অবিচারগুলোর একটা ঘটে: লেভেল মাপে কারও অবস্থান শ্রেণিবিন্যাসে, অর্থের প্রতি তার নৈকট্য নয়। এমন নিচু লেভেলের কর্মচারী আছেন, যাঁরা বহু এক্সিকিউটিভের চেয়ে ভালো বুঝেছেন, সেই প্রতিষ্ঠান কেন আছে আর কার জন্য কাজ করে। আর এমন উঁচু লেভেলের কর্মচারী আছেন, যাঁরা অনেক আগেই নিজেদের সেই প্রশ্ন করা ছেড়ে দিয়েছেন, নিজেদের লেভেলের আড়ালে সুরক্ষিত, যাতে কখনও তা করতে না হয়। লেভেলের ব্যবস্থা এটা মাপার জন্য তৈরি হয়নি — সে পারে না, কারণ একটা উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বস্ততা মাপা তার স্বভাবে নেই। সে শুধু মাপে এমন এক মাপকাঠিতে কারও অবস্থান, যা অন্য কেউ ঠাঁকেছে, যে মানুষ সেখানে বসবে তাকে চেনার অনেক আগে।

তারপর আছে সময় — জ্যেষ্ঠতা, পেরিয়ে যাওয়া বছর, প্রত্যাশিত পদোন্নতি, যা কখনও কখনও কোনোদিন আসেনি — যা লেভেলের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে যায়, কেরিয়ারের শুরুতে খুব কম কর্মচারী যা আগে থেকে দেখতে পান। একটা লেভেল, একবার দেওয়া হলে, এমন এক পরিচয় হয়ে ওঠার দিকে ঝাঁকে, যা কাজটার চেয়েও বেশিদিন বাঁচে: কাজ বদলে গেলেও মানুষ “সেই লেভেল”-ই থেকে যান, এমনকি তখনও, যখন দায়িত্ব বেতনের কাগজে লেখা সংখ্যার চেয়ে দ্রুত বাড়ে। সংক্ষেপে, লেভেল শুরু হয় একটা মাপ হিসেবে, আর অনেকের জন্য শেষ হয় একটা নিয়তি হিসেবে।

যে লেভেলে-ভাগ-করা কাঠামোর ভেতরে যথেষ্ট বছর কাটিয়েছে, সে এমন একটা কথা জানে যা কোনো অর্গানোগ্রাম কখনও খোলাখুলি বলে না: লেভেল তোমাকে বলে একজন মানুষকে কোথায় বসানো হয়েছিল, সেখানে থাকতে থাকতে সেই মানুষটি কী হয়ে উঠেছেন তা নয়। আর প্রতিবার যখন একটা প্রতিষ্ঠান এই তফাতটা ভুলে যায় — লেভেলকে এমনভাবে দেখে যেন সেটাই একজন মানুষের আসল মূল্য, কাঠামোর

একটা সাধারণ খোপ নয় — তখন সে এমন কিছু হারায়, যা কোনো বেতনবৃদ্ধি কখনও ফিরিয়ে দিতে পারবে না: সেই মানুষের আস্থা, যিনি দিনের পর দিন ওপরের মানুষদের মতোই নিষ্ঠায় নিজের কাজ করে গেছেন, জেনেও যে তাঁকে কখনও সত্যিকারের পুরোটা দেখা হবে না।

পরিষেবা সরবরাহকারী

প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, যত বড়ই হোক, কখনও সব কিছু নিজে করে না। তার মূল শরীরের চারপাশে ঘোরে সেবাদাতাদের এক গোটা জগৎ — যাঁরা অফিস পরিষ্কার করেন, যাঁরা মাল পরিবহন করেন, যাঁরা আইটি ব্যবস্থা চালান, যাঁরা তার হয়ে ফোন ধরেন, যাঁরা ক্যান্টিনে খাবার পৌঁছে দেন। তাঁরা প্রতিদিনের উপস্থিতি, প্রায়ই অনেক ভেতরের কর্মচারীর চেয়েও বেশি নিয়মিত, তবু প্রায় সবসময় তাঁরা থেকে যান সেই গল্পের বাইরে, যা প্রতিষ্ঠান নিজের সম্পর্কে বলে। অর্গানোগ্রামে তাঁরা নেই। বার্ষিকী উদ্‌যাপনের কোম্পানির পার্টিতে তাঁদের ডাকা হয় না। আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁরা প্রতিষ্ঠান নন — এমনকি তখনও, যখন প্রতিষ্ঠানটা তাঁদের ছাড়া একদিনেই থেমে যেত।

সেবাদাতা এক বিশেষ অবস্থায় বাঁচেন: তিনি সংগঠনের প্রতিদিনের জীবনের ভেতরে আছেন, তার করিডোর চেনেন, তার ছন্দ চেনেন, কখনও কখনও সেই না-বলা গোপন কথাও, যা শুধু তার কাছেই ভেসে ওঠে, যে একই জায়গায় যথেষ্ট দিন থাকে — কিন্তু চুক্তি আর সংস্কৃতি অনুযায়ী তিনি থেকে যান বহিরাগত। এই আনুষ্ঠানিক দূরত্ব প্রতিষ্ঠানকে এমন একটা সুযোগ দেয়, যা সে কদাচিৎ খোলাখুলি বলে: সে সেবাদাতার কাছে এমন কিছু চাইতে পারে, যা নিজের কর্মচারীর কাছে কখনও চাইত না — দ্রুত ছাঁটাই, কঠোর শর্ত, আগাম নোটিস ছাড়াই বদলি — কারণ সেবাদাতা “আমাদের কেউ” নন। তিনি একটা সেবা, ঠিক তাই, এমন কোনো মানুষ নন, যাঁকে প্রতিষ্ঠান নিজের গল্পে স্বাগত জানাতে বেছে নিয়েছে।

কিন্তু একটা সেবা দিতে হলে সবসময় একজন মানুষ লাগে, যিনি তা সম্পন্ন করবেন। আর সেই মানুষটি বয়ে চলেন একই মর্যাদা, একই পরিশ্রম, কখনও কখনও একই নিষ্ঠা, যা অন্য চুক্তিতে প্রতিষ্ঠানের

ভেতরে কাজ করা মানুষটির আছে। যে সেবাদাতা প্রতি সন্ধ্যায় একই অফিস পরিষ্কার করেন, তিনি সেই জায়গাগুলো অনেক ম্যানেজারের চেয়ে ভালো চেনেন, যাঁরা শুধু দিনের বেলা পার হয়ে যান। যে টেকনিশিয়ান প্রতি সপ্তাহে একই যন্ত্র সারান, তিনি তার ত্রুটিগুলো যে কিনেছে তার চেয়ে ভালো জানেন। তবু প্রতিষ্ঠানের সমষ্টিগত ধারণায় তাঁরা থেকে যান প্রাপ্তে — উপকারী, অপরিহার্য, আর একই সঙ্গে অদৃশ্য।

এই অদৃশ্যতা কোনো দুর্ঘটনা নয়। এটা এক কাঠামোগত সিদ্ধান্ত, যা প্রতিষ্ঠানকে এক বৃহত্তর দায়িত্ব থেকে বাঁচায়: সেবাদাতাকে যদি কোম্পানি-পরিবারের অংশ ধরা হত, তবে প্রতিষ্ঠানকে জবাব দিতে হত তাঁর কাজের পরিস্থিতির জন্য, তাঁর নিরাপত্তার জন্য, সময়ের সঙ্গে তাঁর ধারাবাহিকতার জন্য। তাঁকে আনুষ্ঠানিক সীমানার বাইরে রাখলে প্রতিষ্ঠান তাঁর কাজের সুফল নিতে পারে, তার নৈতিক ভার না বয়ে — এক আউটসোর্সিং, যা শুধু অর্থনৈতিক নয়, নিঃশব্দে নৈতিকও।

যে একটা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে যথেষ্ট দিন কাজ করেছে, সে সেবাদাতাদের মুখ সহকর্মীদের মুখের মতোই চিনতে শেখে — কখনও কখনও আরও ভালো, কারণ তাঁরা আরও নিয়মিত, আরও উপস্থিত, ভেতরের কেরিয়ারের অদলবদলের অধীন কম। আর সে এমন একটা কথাও শেখে, যা কোনো সরবরাহ-চুক্তি কখনও লিখিতভাবে স্বীকার করে না: একটা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকালীন কারণ, যার কথা এই বই বলে চলেছে, একটা চাকরির চুক্তির সীমানায় থেমে যায় না। যদি তা সত্যি হয়, যদি তা এখনও জীবিত থাকে, তবে তার মধ্যে তাঁদেরও থাকা উচিত, যাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে “তাদের কেউ” না হয়েও প্রতিদিন সাহায্য করেন সেই ঘরটাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে, যা সেই কারণ গড়েছিল।

বিক্রয় এজেন্ট

বিক্রয় এজেন্ট এমন এক অবস্থানে থাকেন, যা কোম্পানির অন্য কোনো চরিত্র পুরোপুরি চেনে না: তিনি কর্মচারী নন, সেবাদাতা নন, খদ্দেরও নন। তিনি প্রতিষ্ঠান আর এলাকার মধ্যে এক জীবন্ত সেতু, এমন একজন যিনি একটা সংগঠনের নাম, পণ্য, প্রতিশ্রুতি বয়ে নিয়ে যান এমন সব

জায়গায়, যা প্রতিষ্ঠান নিজে, তার সদর দপ্তর থেকে, কখনও সত্যিই দেখবে না।

এজেন্ট এমন এক কাঠামোগত দ্বন্দ্ব বাঁচেন, যা খুব কম ভূমিকা একই তীব্রতায় সহ্য করে: তিনি এমন একটা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করেন, যার কর্মচারী তিনি নন, তার বাণিজ্যিক ঝুঁকি ভাগ করে নেন তার চুক্তিগত নিরাপত্তা ভাগ না করেই, তার পণ্যকে রক্ষা করেন, সেই পণ্য কীভাবে ঠিক করা হয়, তার দাম কীভাবে বসানো হয়, কীভাবে প্রচার করা হয়, তাতে সবসময় কিছু বলার অধিকার না থাকা সত্ত্বেও। তিনি পান একটা দায়িত্বভার, নির্দিষ্ট বেতন নয়। তিনি বাঁচেন কমিশনে — অর্থাৎ নিজের এলাকায় প্রতি মাসে নতুন করে পাওয়া আস্থায়, অর্গানোগ্রামের ভেতরে বসা মানুষটির সুরক্ষা ছাড়াই।

কিন্তু প্রায়ই তিনিই সেই চরিত্র, যিনি অন্য যে-কারও চেয়ে ভালো জানেন, প্রতিষ্ঠান নিজেকে যা মনে করে আর এলাকা আসলে যা অনুভব করে, তার মধ্যের দূরত্ব। এজেন্ট আসল খদ্দেরকে দেখেন, সেই অভিযোগ শোনে যা কোনো কোম্পানির রিপোর্ট কখনও লিপিবদ্ধ করে না, ঠিক সেই মুহূর্তটা খেয়াল করেন, যখন সদর দপ্তরে দেওয়া একটা প্রতিশ্রুতি তার সামনে টিকতে পারে না, যাকে তা ঘরে ঘরে বিক্রি করতে হবে। তিনি আসল বাজারের আগে শেষ কড়ি, আর সেজন্য তিনি এমন একটা ভার বয়ে বেড়ান, যা কেন্দ্রীয় ম্যানেজমেন্ট কদাচিৎ পুরোপুরি বোঝে: একটা পণ্যে তাঁকে এতটা বিশ্বাস করতে হয় যে প্রতিদিন তাকে রক্ষা করতে পারেন, এমনকি তখনও, যখন সবার আগে তিনিই তার ফাটলগুলো দেখছেন।

এজেন্টের পেশায় এক বিশেষ একাকীত্ব আছে, যা জন্মায় ঠিক এই সীমান্তের অবস্থান থেকে: তিনি কখনও পুরোপুরি তাদের নন, যাদের তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন, আর কখনও পুরোপুরি সেই এলাকারও নন, যার সেবা তিনি করেন। কোম্পানিতে ফিরলে তাঁকে দেখা হয় “এলাকার লোক” হিসেবে। এলাকায় ফিরলে তাঁকে দেখা হয় “কোম্পানির লোক” হিসেবে। তিনি সবসময় এক মাঝের জমিতে বাঁচেন, আর হয়তো সেজন্যই, যখন তিনি নিজের প্রতিনিধিত্ব করা পণ্যের প্রতিষ্ঠাকালীন কারণের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন, তখন তা করেন অনেক ভেতরের

কর্মচারীর চেয়ে বেশি সচেতন এক আনুগত্যে: কেউ তাঁকে তাতে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে না। তিনি প্রতিটি দিন তা বেছে নেন, এমন একজন খদ্দেরের সামনে দাঁড়িয়ে, যিনি না বলতে পারেন।

যে বছরের পর বছর এলাকায় কাটিয়েছে, অচেনা ঘরে, দোকানে, অফিসে এমন একটা নাম বয়ে নিয়ে গেছে যা তার নিজের ছিল না, সে এমন একটা সত্য শেখে, যা প্রতিনিধিত্ব করা প্রতিষ্ঠানের ওপরের তলাগুলোয় কদাচিৎ পৌঁছায়: পণ্য সত্যিকারের বাঁচে না, যতক্ষণ না সে সেই আসল মানুষটির দেখা পায়, যাকে তা কেনার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর সেই সাক্ষাতে একমাত্র যা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ, তা ব্র্যান্ড নয়, তার পেছনের বিজ্ঞাপনের বাজেট নয়, যে কাঠামো তা তৈরি করেছে তা নয় — তা হল সেই আস্তা, যা এজেন্ট নিজে গড়ে তুলতে পেরেছেন, এক এলাকা এক এলাকা করে, এক খদ্দের এক খদ্দের করে, প্রায়ই একা, নিজের কথার জোর ছাড়া আর কিছু সঙ্গে না নিয়ে।

খদ্দের ও প্রচার-পরিকল্পনা

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বে খদ্দেরই এ পর্যন্ত বলা সব কিছুর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য — পণ্য আছে তাঁর জন্য, দাম ভাবা হয় তাঁর জন্য, এজেন্ট প্রতিষ্ঠানের নাম বয়ে নিয়ে যান একেবারে তাঁর কাছ পর্যন্ত। কিন্তু প্রতিদিনের চর্চায় খদ্দের প্রায়ই হয়ে ওঠেন অন্য কিছু: পৌঁছানোর মতো একটা সংখ্যা, রাজি করানোর মতো একটা টার্গেট, অনুমানযোগ্য লিভার দিয়ে নাড়ানোর মতো একটা চলরাশি। প্রোমোশনাল পরিকল্পনাই ঠিক সেই জায়গা, যেখানে এই রূপান্তর ঘটে, সর্বোচ্চ দক্ষতায় আর সর্বনিম্ন কাব্যে।

একটা ছাড়, একটা কিনলে-একটা-ফ্রি, একটা পরিমাণ-বোনাস: এগুলো কারিগরিভাবে নিখুঁত হাতিয়ার, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, ছেড়ে দেওয়া মার্জিন, বিনিময়ে প্রত্যাশিত পরিমাণের নিখুঁত হিসেবের ওপর গড়া। কিন্তু প্রতিটি প্রোমোশনাল পরিকল্পনার পেছনে লুকিয়ে থাকে একটা প্রশ্ন, যা কদাচিৎ জোরে জিজ্ঞেস করা হয়: যিনি এই অফার পাচ্ছেন, আমরা কি তাঁকে সত্যিকারের মূল্য দিচ্ছি, নাকি শুধু সীমিত সময়ের জন্য তাঁর আচরণ কিনে নিচ্ছি? তফাতটা কাগজে সূক্ষ্ম, সারবস্তুতে বিরাট।

সত্যিকারের মূল্যে জয় করা খন্দের থেকে যান, কারণ তিনি এমন কিছু পেয়েছেন যা তাঁর দরকার। প্রমোশনে জয় করা খন্দের থাকেন শুধু ততক্ষণ, যতক্ষণ প্রমোশন চলে, আর চলে যান, কোনো ক্ষোভ ছাড়া, কোনো আনুগত্য ছাড়া, যে মুহূর্তে কোনো প্রতিযোগী পরেরটা দেয়।

প্রমোশনাল পরিকল্পনা, ত্রৈমাসিকের পর ত্রৈমাসিক বারবার, নিঃশব্দে খন্দেরকে শেখায় এমন এক সম্পর্ক গড়তে, যার ভিত্তি পণ্যের ওপর আস্তা নয়, ছাড়ের অপেক্ষা। আর এটা সময়ের সঙ্গে সম্পর্কের স্বভাবটাই বদলে দেয়: খন্দের জিজ্ঞেস করা ছেড়ে দেন “এই পণ্য কি সত্যিই আমার কাজে লাগে?” আর শুধু জিজ্ঞেস করতে শুরু করেন “পরের অফার কবে আসবে?” প্রতিষ্ঠান, তার দিক থেকে, নিজের দেওয়া আসল মূল্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার দায় থেকে মুক্ত হয়ে যায়, কারণ সে পরিমাণ নাড়ানোর একটা সহজতর, তাৎক্ষণিক কৌশল পেয়ে গেছে: পণ্যকে উন্নত করা নয়, সাময়িকভাবে তার দাম কমানো।

এতে খন্দের সরল হয়ে যান না, প্রতিষ্ঠানও সংজ্ঞাগতভাবে নিষ্ঠুর হয়ে যায় না — এটা শুধু সেই কৌশল, যা নিজে থেকে গড়ে ওঠে, যখন দুই পক্ষ সময়ের সঙ্গে শুধু একটা অফারের ছাঁকনির ভেতর দিয়ে দেখা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। খন্দের বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন কখন কেনা লাভজনক তা চিনতে। প্রতিষ্ঠান বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে মার্জিন ক্ষয় হওয়ার আগে কতটা ছাড় সহনীয় তা হিসেব করতে। কিন্তু সবচেয়ে সরল প্রশ্নটা — ছাড় ছাড়াও এই পণ্য কেন তোমার আগ্রহের হওয়া উচিত — বহু প্রমোশনাল পরিকল্পনায় উত্তরহীন থেকে যায়।

যে বছরের পর বছর প্রমোশনাল পরিকল্পনা বানিয়েছে, সে জানে একজন খন্দেরের আসল মূল্য কখনও মাপা হয় না তিনি একটা অফারে কতটা সাড়া দেন তা দিয়ে, মাপা হয় তিনি কতটা অনুগত থাকতেন তা দিয়ে, এমনকি সেই দিনও, যেদিন অফারটা আর থাকত না। আর হয়তো এটাই সবচেয়ে সৎ প্রশ্ন, যা একটা প্রতিষ্ঠানের পরের প্রমোশন চালুর আগে নিজেকে করা উচিত: যদি আমরা ছাড়টা তুলে নিই, তবুও কি কেনার মতো কিছু থাকবে?

উদ্যোগ, ধরন, শ্রেণিবিভাগ

প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, তার গল্প বলা হওয়ার আগেই, শ্রেণিবদ্ধ হয়ে যায়। খাত, আকার, আইনি রূপ, লক্ষ্য-বাজার, এমন এক পরিসংখ্যানগত কোড যা তাকে হাজার হাজার একই রকম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা বর্গে বসিয়ে দেয়। এটাই প্রথম আমলাতান্ত্রিক কাজ, যা প্রতিটি ব্যবসা তার জন্মের মুহূর্ত থেকে সয়: একটা খোপে ফাইল হয়ে যাওয়া, সে আসলে কী, তা কখনও দেখানোর আগেই।

শ্রেণিবিভাগের একটা অনস্বীকার্য কাজ আছে: সে তুলনা করতে দেয়, মাপতে দেয়, একটা প্রতিষ্ঠানকে এক বৃহত্তর দৃশ্যপটে বসাতে দেয়, বুঝতে দেয় সে তার সমকক্ষদের চেয়ে দ্রুত বাড়ছে না ধীরে। কিন্তু প্রতিটি শ্রেণিবিভাগ, উপকারী হতে হলে, সরল করতে বাধ্য — আর প্রতিটি সরলীকরণ, কার্যকর হতে হলে, কেটে বাদ দিতে বাধ্য সেই জিনিস, যা ওই প্রতিষ্ঠানকে অনন্য করে। একটাই একগুঁয়ে ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত একটা ছোট ব্যবসা গিয়ে পড়ে সেই একই পরিসংখ্যানগত বর্গে, যেখানে আছে বিনিয়োগ তহবিলের একীভবনে জন্মানো একটা বহুজাতিক। কোড তফাত করে না। সে শুধু মাপে আকার, আয়, শিল্পখাত — কখনও সেই কারণ নয়, যার জন্য জিনিসটা জন্মেছিল।

এই কৌশলে এক নিঃশব্দ ঝুঁকি আছে: প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই শেষে নিজেদের ভাবতে পারে সেই বর্গের ভেতর দিয়ে, যেখানে তাদের বসানো হয়েছে, নিজেদের আদি গল্পের ভেতর দিয়ে নয়। “X খাতের মাঝারি আকারের কোম্পানি” হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ একটা ব্যবসা সময়ের সঙ্গে সেভাবেই আচরণ করতে শুরু করে, যেভাবে X খাতের একটা মাঝারি আকারের কোম্পানির কাছে আচরণ প্রত্যাশিত — সমকক্ষদের কৌশল নকল করে, একই সূচকের পেছনে ছোট্টে, একই ঝুঁকিকে ভয় পায়, শুধু এই কারণে যে বর্গটা ইঙ্গিত দেয় কোন আচরণ প্রত্যাশিত। শ্রেণিবিভাগ, যার কাজ ছিল বর্ণনা করা, শেষে নির্দেশ দিতে শুরু করে।

তারপর আছে এক গভীরতর ধরন, যা কোনো পরিসংখ্যানগত কোড লিপিবদ্ধ করে না: সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তফাত, যা এখনও সেই কারণের জন্যই আছে যার জন্য সে জন্মেছিল, আর সেই প্রতিষ্ঠান, যা আছে শুধু এজন্য যে সে “কেন” জিজ্ঞেস করা ছেড়ে দিয়েছে আর

জড়তার বশে চলে যাচ্ছে, সবসময় যা করে এসেছে তা-ই করে। এই পার্থক্য কোনো ডেটাবেসে দেখা যায় না, কোনো ব্যবসায়িক রেজিস্টারে এর জন্য আলাদা কোনো খোপ নেই। তবু শেষ পর্যন্ত এটাই একমাত্র শ্রেণিবিভাগ, যা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ — আকার, খাত বা ঘোষিত আয়ের চেয়ে অনেক বেশি।

যে মানুষ বছরের পর বছর ধরে সব ধরনের, সব আকারের প্রতিষ্ঠান দেখেছে, সে একটা প্রতিষ্ঠানের আসল সারবস্তু বুঝতে গিয়ে সরকারি শ্রেণিবিভাগকে অবিশ্বাস করতে শেখে। দুটো প্রতিষ্ঠানের একই কোড, একই খাত, কাগজে-কলমে একই আকার থাকতে পারে — তবু একটা জীবন্ত থাকতে পারে, নিজের উৎসের প্রতি বিশ্বস্ত, আর অন্যটা ইতিমধ্যেই কেবল একটা কাঠামো, যে দারুণ দক্ষতায় এমন এক আত্মার ভান করে যা তার আর নেই।

বেতন, মূল হার, স্কেলের বাড়তি বেতন, বোনাস, প্রগোদনা

প্রতিটা বেতনের কাগজ, না চেয়েও, সংখ্যাগুলো যতটা বোঝায় তার চেয়ে লম্বা একটা গল্প বলে। আছে চুক্তির ন্যূনতম বেতন, যা ঠিক করেছে এমন এক যৌথ চুক্তি যার আলোচনায় কোম্পানিতে উপস্থিত কোনো পক্ষই নিজে বসেনি — অন্য কোথাও, দূরের এক টেবিলে স্থির হওয়া একটা মেঝে, হাজার হাজার মানুষের জন্য প্রযোজ্য যারা সেই টেবিল কখনও দেখেনি। আর তারপর আছে চুক্তির বাড়তি বেতন, সেই অংশ যা প্রতিষ্ঠান নিজের ইচ্ছায় যোগ করে, আর এখান থেকেই পুরো ব্যাপারটার সবচেয়ে নাজুক অংশ শুরু হয়: বাড়তি বেতন আইনত প্রাপ্য নয়, তা দেওয়া হয়, আর যা দেওয়া হয় তা সবসময় যে পায় তার ওপর এক নীরব ক্ষমতা সঙ্গে নিয়ে আসে।

বাড়তি বেতনের হওয়া উচিত একটা নির্দিষ্ট মূল্যের স্বীকৃতি — বিরল দক্ষতা, বাড়তি দায়িত্ব, সময়ের সঙ্গে গড়ে ওঠা আনুগত্য। কিন্তু অনেক বেশি প্রতিষ্ঠানে তা ন্যায়ের চেয়ে বেশি পরিচালনার হাতিয়ার হয়ে যায়: এমন কিছু যা ধরে রাখার জন্য দেওয়া যায়, সামলে রাখার জন্য আটকে রাখা যায়, উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায়, সবসময় যার হাতে তা ঠিক করার ক্ষমতা তার মর্জিমতো। একই পদ, একই পরিশ্রম,

একই দৈনিক অবদানের দুজন মানুষ আলাদা আলাদা বাড়তি বেতন পেতে পারে — যোগ্যতার কোনো বস্তুনিষ্ঠ পার্থক্যের জন্য নয়, বরং দর-কষাকষির পার্থক্যের জন্য, কোন মুহূর্তে তাদের নিয়োগ হয়েছিল তার জন্য, সেই মানুষটা নিজেকে কতটা জাহির করতে জানত বা পারত তার জন্য।

বোনাস আর প্রণোদনা এই যুক্তিকে আরও দূরে ঠেলে দেয়: তারা টাকাকে বেঁধে দেয় একটা নির্দিষ্ট, মাপা যায় এমন, বারবার করা যায় এমন আচরণের সঙ্গে। এগুলো কাজ করে — এটা সততার সঙ্গে বলতেই হবে — কারণ মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয়; প্রতিষ্ঠানের ভেতরে মানুষের আচরণের প্রায় সর্বজনীন যে অল্প কয়টা নিয়ম আছে, এটা তার একটা। কিন্তু প্রতিটা প্রণোদনাকে কার্যকর হতে হলে জটিল কাজকে একটা মাপা যায় এমন সূচকে সরল করতে হয়, আর সেই সরলীকরণে সবসময় কিছু একটা হারিয়ে যায়। বিক্রির পরিমাণের ওপর প্রণোদনা পাওয়া বিক্রেতা পরিমাণই বিক্রি করবে, এমনকি যখন খদ্দেরের দরকার বেশি নয়, কম। ত্রৈমাসিক মার্জিনের ওপর প্রণোদনা পাওয়া ম্যানেজার সেটাই কাটবে যা ত্রৈমাসিক মার্জিন দেখতে পায় না, এমনকি যখন সেই কাটছাঁট দু বছর পরে চড়া দামে শোধ করতে হবে।

একটা প্রশ্ন আছে যা পুরো বেতন-ব্যবস্থা — ন্যূনতম বেতন, বাড়তি বেতন, বোনাস আর প্রণোদনার তার পুরো স্থাপত্য নিয়ে — নিয়ম করে নিজেকে জিজ্ঞেস করা এড়িয়ে যায়: আমরা কি এই মানুষটাকে টাকা দিচ্ছি এই প্রতিষ্ঠান যে কারণে আছে তার প্রতি তার বিশ্বস্ততার জন্য, নাকি এমন আচরণের জন্য যা যোগ করলে কেবল ত্রৈমাসিকের সংখ্যাগুলোকে ভারসাম্যে রাখতে কাজে লাগে? এ দুটো আলাদা জিনিস, আর একটা ভালোভাবে বানানো প্রণোদনা-ব্যবস্থা দ্বিতীয়টায় চমৎকার ফল পেতে পারে, আর নীরবে প্রথমটাকে ক্ষয়িয়ে দিতে পারে।

যে বছরের পর বছর এই কলকবজার ভেতরে বেঁচেছে, টেবিলের দুই দিকেই — বেতন ঠিক করেছে আর বেতন পেয়েছে — সে জানে যে প্রতিষ্ঠানে টাকা কখনও শুধু টাকা নয়। এটা একটা ভাষা, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান প্রতি মাসে প্রত্যেককে বলে তার চোখে সে কতটা মূল্যবান। আর যখন সেই ভাষা সৎ থাকা বন্ধ করে — যখন বাড়তি বেতন অবদান

রাখার ক্ষমতার চেয়ে দর-কষাকষির দক্ষতাকে বেশি পুরস্কৃত করে, যখন প্রণোদনা সেই সারবস্তুর চেয়ে সংখ্যাটাকে বেশি পুরস্কৃত করে যার প্রতিনিধিত্ব করার কথা ছিল সেই সংখ্যার — বেতন সময়মতোই আসতে থাকে, কিন্তু মানুষ আর যে প্রতিষ্ঠান তাকে টাকা দেয় তাদের মধ্যকার আস্থায় কিছু একটা নীরবে ফাটতে শুরু করে।

সুবিধা

সুযোগ-সুবিধার জন্ম হয় একটা কোমল প্রতিশ্রুতি নিয়ে: শুধু বেতনটাই আসল নয়, প্রতিষ্ঠান টাকার বাইরেও তোমার যত্ন নেয়। কোম্পানির গাড়ি, স্বাস্থ্যবিমা, ফোন, খাবারের কুপন, জিমের সদস্যপদ, মেনুর মতো বেছে নেওয়ার জন্য কর্পোরেট কল্যাণের তালিকা। রূপে এগুলো মনোযোগের কাজ। সারবস্তুতে এগুলো আরও কিছু, যা সুবিধাটা দেওয়ার মুহূর্তে কদাচিৎ জোরে বলা হয়।

সুযোগ-সুবিধা বেঁধে রাখে। বেতন বাড়ার চেয়েও বেশি, যা একবার পেলে পুরোপুরি যে পায় তারই হয়ে যায়, সুযোগ-সুবিধা আসলে সবসময় সেই প্রতিষ্ঠানেরই সম্পত্তি থেকে যায় যে তা দেয়। সম্পর্ক শেষ হলে গাড়ি ফেরত দিতে হয়। স্বাস্থ্যবিমা কেবল ততদিনই ঢাকে যতদিন তুমি কর্মী, এক দিনও বেশি নয়। মোট কথা, সুযোগ-সুবিধা শব্দটার পূর্ণ অর্থে কখনও সত্যিকারের উপহার নয় — এটা একটা দীর্ঘমেয়াদি ধার, থেকে যাওয়ার শর্তে, যা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে আবেগে আর বাস্তবে আরও দামি করে তোলে।

এর মানে এই নয় যে সুযোগ-সুবিধা অসৎ উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। অনেক প্রতিষ্ঠান সেগুলো আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে দেয়, যারা সেখানে কাজ করে তাদের জীবন সত্যিই ভালো করার জন্য। কিন্তু সুযোগ-সুবিধার কাঠামোটাই — চুক্তির সঙ্গে বাঁধা, প্রত্যাহারযোগ্য, প্রায়ই আসল প্রয়োজনের বদলে অধিকৃত পদের অনুপাতে — এটাকে একটা দ্ব্যর্থক হাতিয়ার করে তোলে: একই ভঙ্গিতে তা যত্নও নেয়, ধরেও রাখে। বড় সুযোগ-সুবিধা পাওয়া একজন কর্মী চাকরি বদলানোর আগে দুবার ভাববে, এমনকি যখন কাজটা নিজেই তাকে আর তৃপ্তি দেয় না, কারণ

চলে যাওয়ার দাম আর শুধু বেতন নয়: এটা সেই সবকিছু যা সুযোগ-সুবিধা নীরবে তার দৈনন্দিন জীবনের চারপাশে গড়ে তুলেছে।

এখানেও একটা লুকোনো স্তরবিন্যাস আছে, পদের ক্ষেত্রে যা নিয়ে আগেই কথা হয়েছে তার বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি: সবচেয়ে উদার সুযোগ-সুবিধা প্রায় সবসময় যায় তার কাছে যে ইতিমধ্যেই উঁচু পদে আছে, যার সবচেয়ে বেশি দরকার তার কাছে নয়। নির্বাহী পান সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যবিমা, সবচেয়ে মর্যাদার গাড়ি, সবচেয়ে বড় কল্যাণ-প্যাকেজ। পিরামিডের তলায় থাকা কর্মী পায়, খুব বেশি হলে, যৌথ চুক্তির দাবি করা ন্যূনতমটুকু। সুযোগ-সুবিধা, যা তত্ত্বে মানুষের প্রতি মনোযোগের চিহ্ন হওয়ার কথা, শেষ পর্যন্ত বণ্টিত হয় সেই একই স্তরবিন্যাসের যুক্তিতে যা বাকি সবকিছু চালায় — মনোযোগ ইতিমধ্যে অধিকৃত ক্ষমতার অনুপাতে, আসল প্রয়োজনের অনুপাতে নয়।

যে বছরের পর বছর সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে, আর দেখেছে অন্যরা এমন কারণে কম বা বেশি পাচ্ছে যার সঙ্গে যোগ্যতার সম্পর্ক সামান্যই, সে শব্দটার কোমল উপরিতলের ওপারে তাকাতে শেখে। আসল সুবিধা, সেটা যা একটা প্রতিষ্ঠান দিত যদি সে নিজের প্রতিষ্ঠার কারণের প্রতি সত্যিই বিশ্বস্ত হত, তা হওয়া উচিত নয় এমন এক সোনার শিকল যা ইতিমধ্যে স্বীকৃত মূল্যের মানুষকে ধরে রাখে। এটা হওয়া উচিত সৎভাবে বলার একটা উপায়: তুমি যে কাজ করো তার বাইরেও আমরা তোমার কথা ভাবি — আর এটা একইভাবে, একই কারণে খাটা উচিত সেই মানুষের ক্ষেত্রেও যে একই কাঠামোর চূড়ায় আছে, আর যে তার তলায় আছে তার ক্ষেত্রেও।

শেয়ার ও স্টক অপশন

অনেক কর্মজীবনের ইতিহাসে একটা মুহূর্ত আসে, যখন পারিশ্রমিক শুধু বর্তমানের টাকা থাকা বন্ধ করে আর ভবিষ্যতের ওপর একটা বাজি হয়ে যায়। এটা সেই মুহূর্ত যখন শেয়ার, বা তার ওপর একটা অপশন, আসে: আমি তোমাকে শুধু আজকের কাজের জন্য টাকা দিচ্ছি না, আমি তোমাকে দিচ্ছি প্রতিষ্ঠানটা কাল যা মূল্যের হতে পারে তার একটা ভাগ। প্রথম দেখায় এটা সবচেয়ে মার্জিত ভঙ্গি যা একটা প্রতিষ্ঠান তার কর্মীদের

প্রতি করতে পারে — একজন কর্মীকে এক ধরনের ছোট মালিকে পরিণত করা, তার স্বার্থকে প্রতিষ্ঠানের নিজের স্বার্থের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া।

কিন্তু শেয়ারের, বেতনের থেকে আলাদা, এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে যা সবকিছু বদলে দেয়: তার মূল্য নির্ভর করে না আজ কতটা সৎ কাজ হল তার ওপর, নির্ভর করে বাজার কাল বিশ্বাস করবে সেই কাজ কতটা মূল্যবান তার ওপর। আর বাজার, যেমন এই বই অন্য পাতায় আগেই বলেছে, সবসময় সারবস্তুকে পুরস্কৃত করে না — প্রায়ই পুরস্কৃত করে ন্যারেটিভকে, ধারণাকে, সমষ্টিগত প্রত্যাশাকে। তাই যে স্টক অপশন পায়, তার প্রণোদনা শুধু ভালো কাজ করার নয়। তার প্রণোদনা, নীরবে, বাজারকে বিশ্বাস করানোর যে সে ভালো কাজ করছে — আর চাপ যখন বাড়ে, দুটোর মধ্যকার পার্থক্য বিপজ্জনকভাবে সফু হয়ে যেতে পারে।

এতে এমন এক টানাপোড়েন তৈরি হয় যা অল্প লোকই খোলাখুলি স্বীকার করে: যার হাতে উল্লেখযোগ্য শেয়ার আছে, সে প্রতিটা কর্পোরেট সিদ্ধান্তকে দেখতে শুরু করে শুধু এই প্রশ্ন দিয়ে নয় “এটা কি পণ্যের, খদ্দেরের, আমরা যে কারণে জন্মেছি তার কাজে লাগে?”, বরং দ্বিতীয় একটা প্রশ্ন দিয়ে, প্রায়ই প্রথমটার চেয়ে জোরালো: “এতে আমার শেয়ার উঠবে না নামবে?” সবচেয়ে ভালো ক্ষেত্রে দুটো প্রশ্ন মিলে যায়। কিন্তু যখন তারা মেলা বন্ধ করে — যখন পণ্যের সত্যিকারের প্রয়োজন এমন এক বিনিয়োগ দাবি করে যা বাজার স্বল্পমেয়াদে পুরস্কৃত করবে না — দ্বিতীয় প্রশ্নটা প্রায় সবসময় জেতে, কারণ সেটাই সরাসরি সিদ্ধান্ত নেওয়া মানুষটার ব্যক্তিগত সম্পদ ছুঁয়ে যায়।

তার ওপর, স্টক অপশন তাদের সুবিধা বণ্টন করে সেই একই স্তরবিন্যাস ধরে যা সুযোগ-সুবিধা আর বাড়তি বেতনের ক্ষেত্রে আগেই দেখা গেছে: চূড়ায় প্রচুর, তলায় প্রায়ই কিছুই না। যার হাতে সেই কৌশল ঠিক করার ক্ষমতা যা প্রতিষ্ঠানের মূল্য বাড়াবে বা কমাবে, সে প্রায় সবসময় সেই একই মানুষ যার কাছে সেই শেয়ার আছে যা থেকে লাভ হওয়ার কথা। এটা এমন এক শর্ট সার্কিট যাকে কর্পোরেট ভাষা বলে “স্বার্থের সমন্বয়”, কিন্তু যা কখনও কখনও আরও সৎ একটা নামের যোগ্য: এমন সিদ্ধান্তের জন্য পুরস্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা যা অন্যদের,

যাদের কোনো শেয়ার নেই, কেবল কার্যকর করতে আর সহ্য করতে হবে।

যে শেয়ারের যুক্তির কাছাকাছি বেঁচেছে — দেখেছে সহকর্মীরা শেয়ারের দাম বাড়ার কল্যাণে কয়েক বছরে বিপুল ধনী হয়ে গেছে, আর অন্যরা, সমান যোগ্য, সেই একই সৌভাগ্যের বাইরে থেকে গেছে কারণ তারা এক বছর পরে এসেছিল বা নিচু পদে নিয়োগ পেয়েছিল — সে জানে যে শেয়ার কখনও কেবল যোগ্যতার পুরস্কার নয়। এটা ভবিষ্যতের ওপর একটা সমষ্টিগত বাজি, বর্তমানে ইতিমধ্যে অধিকৃত ক্ষমতা অনুযায়ী বন্টিত। আর প্রতিটা বাজির মতো, এটা বিজয়ীদের উদারভাবে ফেরত দিতে পারে, আর বাকি সবাইকে নীরবে ভাবিয়ে রেখে যেতে পারে কেন এটা তাদের জন্যও কখনও সত্যিকারের সম্ভাবনা ছিল না।

ছাটাই ও বিনিয়োগ

প্রতিটা প্রতিষ্ঠান, তার জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে, দুটো কাজের একটা করছে: কাটছাট, নয়তো বিনিয়োগ। পুঁজি যখন নড়ে, এ দুটোই একমাত্র সম্ভাব্য দিক, আর এরাই প্রায় সবসময় সবচেয়ে সৎ চিহ্ন যে সেই প্রতিষ্ঠান নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সত্যিই কী বিশ্বাস করে — সাক্ষাৎকারে যা ঘোষণা করে তা নয়, বরং ব্যালান্স শিটের বাইরে কেউ যখন তাকিয়ে নেই তখন নিজের টাকা দিয়ে কী করার সিদ্ধান্ত নেয়।

কাটছাটের একটা তাৎক্ষণিক যুক্তি আছে, স্বল্পমেয়াদে প্রায় সবসময় সমর্থনযোগ্য: একটা খরচ কমে, মার্জিন সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়, পরের ত্রৈমাসিক আরও শক্ত দেখায়। মিটিংয়ে এটাই সমর্থন করার সবচেয়ে সহজ দিক, কারণ খুব অল্প সময়ে চোখে পড়ার মতো ফল দেয়। কিন্তু কাটছাট, প্রায় সবসময়, যা ইতিমধ্যে গড়া হয়েছে তার ওপর কাজ করে — সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যা ছিল তাকে কমায়, চাপে, মুছে ফেলে। কর্মী কাটা, রক্ষণাবেক্ষণ কাটা, গবেষণা কাটা: এ সবই একই ভঙ্গির নানা রূপ, এমন এক শরীরকে হালকা করা যা এক মুহূর্ত আগেও একটা নির্দিষ্ট কারণে সেই ভার বইছিল — যদিও সেই কারণ, কাটছাটের মুহূর্তে, হঠাৎ গুরুত্ব হারায়।

বিনিয়োগ অন্য দিকটা, কম তাৎক্ষণিক, স্বল্পমেয়াদে কম আশ্বাসদায়ক, কারণ এর জন্য এমন কিছুতে বিশ্বাস করতে হয় যা এখনও নেই। বিনিয়োগ মানে আজ খরচ করা এমন এক লাভের জন্য যা আসবে, হয়তো, কয়েক মাস বা কয়েক বছরে — আর এই সময়ের ফাঁকটাই বিনিয়োগকে বিরলতর পছন্দ করে তোলে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতরে যারা ত্রৈমাসিকের সেই ছন্দে চলে যা নিয়ে এই পাতাগুলোয় আগেই কথা হয়েছে। যে বিনিয়োগ করে সে ভবিষ্যতের ওপর বাজি ধরে, তখনই তা প্রমাণ করতে না পেরে। যে কাটছাঁট করে সে বর্তমানকে ভালো করে, চলতি ত্রৈমাসিকের বাইরে কোনো জবাবদিহি ছাড়াই। আশ্চর্যের কিছু নেই যে, বেছে নেওয়ার সুযোগ পেলে, দ্বিতীয় পথটা প্রথমটার চেয়ে অনেক বেশি বার বেছে নেওয়া হয়।

কিন্তু এখানেই পুরো বইয়ের সবচেয়ে নির্ণায়ক মোড়: যে প্রতিষ্ঠান নিজের প্রতিষ্ঠার কারণ বাঁচিয়ে রাখতে যা দরকার তা-ই কাটে — যারা তা মনে রাখে সেই মানুষদের, যে মান তার প্রতিনিধি, কাজ ভালোভাবে করতে যে সময় লাগে — সে অর্থের টিকে থাকার বদলে সংখ্যার টিকে থাকা বেছে নিচ্ছে। যে প্রতিষ্ঠান সেই একই অর্থে বিনিয়োগ করে, এমনকি যখন দাম দিতে হয়, এমনকি যখন বাজার সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কৃত করে না, সে সেই একমাত্র কাজটা করছে যা একটা প্রতিষ্ঠানকে নিজের কাঠামোর বাইরেও জীবন্ত থাকতে দেয়: যার জন্য সে জন্মেছে তাকে পুষ্ট করা, শুধু সেটাকে নয় যা স্বল্পমেয়াদে হিসাব মিলিয়ে দেয়।

প্রতিটা কাটছাঁট বিশ্বাসঘাতকতা নয়, আর প্রতিটা বিনিয়োগ বিশ্বাসের যোগ্য কাজ নয়। প্রয়োজনীয় কাটছাঁট আছে, যা কেবল অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাওয়া জিনিসটুকুই সরায়। আর অপচয়ের বিনিয়োগ আছে, অহংকার বা সেই মুহূর্তের ফ্যাশনের জন্য করা, মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে কোনো আসল যোগ ছাড়া। পার্থক্যটা শব্দে নয় — কাটছাঁট না বিনিয়োগ — বরং এমন এক প্রশ্নে যা অল্প কয়টা মিটিংই সিদ্ধান্তে সই করার আগে সত্যিই জিজ্ঞেস করে: পুঁজির এই নড়াচড়া কি আমাদের সেই কারণের কাছে নিয়ে যায়, নাকি তার থেকে দূরে, যে কারণে এই প্রতিষ্ঠান জন্মেছিল? যে বছরের পর বছর যথেষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কাটছাঁট আর বিনিয়োগ করতে দেখেছে, সে জানে যে এই প্রশ্ন, যতটা সরল ততটাই

অস্বস্তিকর, যে কোনো আর্থিক বিশ্লেষণের চেয়ে বেশি মূল্যবান, যা একে এড়ানোর জন্যই বানানো।

ব্যালান্স শিট ও ভুল

ব্যালান্স শিট সবসময় নিজেকে হাজির করে এক চূড়ান্ত দলিলের কর্তৃত্ব নিয়ে: বন্ধ সংখ্যা, যাচাই করা, বাইরের নিরীক্ষকদের দ্বারা প্রত্যয়িত যারা নির্ভুলতার নিশ্চয়তা হিসেবে নিজেদের সহি দেয়। এটা সেই দলিল যা একটা প্রতিষ্ঠান নিজের দৃঢ়তার চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে দুনিয়াকে দেখায় — আর ঠিক এই কারণেই অল্প লোকই থেমে জিজ্ঞেস করে যে সেই আপাত নির্ভুলতার নিচে কতটা লুকিয়ে আছে পছন্দ, অনুমান, আর কখনও কখনও এমন ভুল যা কোনো নিরীক্ষকের সহি কখনও পুরোপুরি মুছতে পারে না।

একটা ব্যালান্স শিট কখনও বিশুদ্ধ তথ্য নয়। এটা একটা ব্যাখ্যা — বৈধ, নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু তবু ব্যাখ্যা — এমন সব ঘটনার, যাদের প্রায়ই কোনো বস্তুনিষ্ঠ মূল্য দেওয়ার উপায় নেই। ত্রিশ বছর ধরে গড়া একটা ব্র্যান্ডের দাম কত? একজন বিশ্বস্ত খদ্দেরের সঙ্গে সম্পর্কের দাম কত, যা কাল শেষ হতে পারে বা চিরকাল টিকতে পারে? একটা যন্ত্রের সত্যিকারের কার্যকর আয়ু কত, আর সেই অনুমানের কতটা যুক্তিসঙ্গত পূর্বাভাস, কতটা হিসাবের ছদ্মবেশে একটা ইচ্ছা? প্রতিটা ব্যালান্স শিট এমন সংখ্যায় ভরা যা দেখতে তথ্যের মতো আর সারবস্তুতে বিচার — সং উদ্দেশ্যে করা, প্রায় সবসময়, কিন্তু তবু বিচার, যার সঙ্গে আছে ভুলের এমন এক পরিসর যা চূড়ান্ত দলিল কখনও খোলাখুলি দেখায় না।

আর তারপর আছে আসল ভুল, সেই ধরনের যা সবচেয়ে সং প্রতিষ্ঠানেও ঘটে: ভুল সময়কালে লেখা একটা চালান, ভুল খাতে ধরা একটা খরচ, এমন এক অনুমানের ওপর হিসাব করা একটা সংস্থান যা কয়েক মাস পরে ভুল প্রমাণিত হবে। হিসাবরক্ষণ-ব্যবস্থা সময়ের সঙ্গে এই ভুলগুলো কমানোর জন্য সূক্ষ্ম কলকবজা গড়ে তুলেছে — দ্বিগুণ যাচাই, স্বাধীন নিরীক্ষা, ক্রমশ আরও বিস্তারিত হিসাবনীতি — কিন্তু কোনো ব্যবস্থা, যত পরিশীলিতই হোক, এই সম্ভাবনা পুরোপুরি মুছতে পারে না যে একটা

প্রকাশিত সংখ্যা যে বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করার কথা তার সঙ্গে
নিখুঁতভাবে মেলে না।

একটা বিরাট নৈতিক পার্থক্য আছে, যা বাইরে থেকে ব্যালান্স শিট দেখা
মানুষ প্রায়ই উপেক্ষা করে, একটা সৎ ভুল আর ইচ্ছাকৃত কারসাজির
মধ্যে। সৎ ভুলের জন্ম হয় একটা জীবন্ত প্রতিষ্ঠানকে এমন হাতিয়ার
দিয়ে মাপার জটিলতা থেকেই, যাদের প্রয়োজনের খাতিরে সরল করতেই
হয়। কারসাজির জন্ম হয় বরং একটা পছন্দ থেকে: সংখ্যাগুলোকে দিয়ে
এমন কিছু বলানোর সিদ্ধান্ত যা তথ্য নিজে থেকে বলত না। দুটোই এমন
এক ব্যালান্স শিট তৈরি করে যা বাস্তবতা থেকে সরে যায়। দুটোর মধ্যে
কেবল একটাই বিশ্বাসঘাতকতা।

যে বছরের পর বছর ব্যালান্স শিট পড়েছে আর বানিয়েছে, সে জানে যে
চূড়ান্ত সংখ্যা, যত প্রত্যয়িতই হোক, দুই দশমিকের নির্ভুলতায় যত
আশ্বাসদায়কই হোক, সবসময় একটা গল্পই থেকে যায় — যতটা সম্ভব
নির্ভুল, কিন্তু তবু মানুষের বানানো একটা গল্প, সেই অনুমান, বিচার আর
কখনও কখনও ভুল নিয়ে যা প্রতিটা মানুষের গল্প অনিবার্যভাবে সঙ্গে
বয়ে আনে। একটা ব্যালান্স শিটকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা, যেন তা
বাস্তবতার একটা বস্তুনিষ্ঠ ছবি, মানে ভুলে যাওয়া যে প্রতিটা অঙ্কের
পেছনে সবসময় কেউ একজন আছে যাকে ঠিক করতে হয়েছিল
কীভাবে তা গুনবে — আর যে ঠিক করে কোনো কিছু কীভাবে গুনবে,
পুরোপুরি সৎ উদ্দেশ্যেও, সে ইতিমধ্যেই, কিছুটা হলেও, বেছে নিচ্ছে
কোন সত্যটা দেখাবে।

বাইরের বিশ্লেষক

বাইরের বিশ্লেষক বাঁচে একটা নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির ওপর: একটা
প্রতিষ্ঠানকে বাইরে থেকে দেখা, ভেতরে যারা কাজ করে তাদের স্বার্থ
ছাড়া, আর বাজারকে বলা তার আসল মূল্য কত। এটা বস্তুনিষ্ঠতার
নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য ভাবা একটা চরিত্র — এমন কেউ যার সত্যি বলে
হারানোর কিছু নেই, কারণ তার একমাত্র মুদ্রা তার নিজের বিচারের
বিশ্বাসযোগ্যতা। কিন্তু এই দূরত্ব, যা তার শক্তি হওয়ার কথা, তার পেশার

সবচেয়ে গভীর সীমাও: বিশ্লেষক সবসময় বাইরে থেকে বিচার করে এমন এক জিনিসকে যা সত্যিই জানা যায় কেবল ভেতর থেকে।

একজন বিশ্লেষক ব্যালাপ্স শিট পড়ে, ত্রৈমাসিক কনফারেন্স কল শোনে, প্রতিযোগীদের সঙ্গে সূচক মেলায়, যা মাপা যায় আর প্রকাশ্য তার ভিত্তিতে পূর্বাভাসের মডেল বানায়। এ সব মিলে এমন এক বিচার তৈরি হয় যা প্রযুক্তিগতভাবে মজবুত, সমর্থনযোগ্য, প্রায়ই কাজের। কিন্তু তা কখনও ধরতে পারে না সেই একটা জিনিস যা এই বই প্রতিটা পাতায় খুঁজে চলে: সেই প্রতিষ্ঠান কি এখনও সেই কারণের প্রতি বিশ্বস্ত যে কারণে সে জন্মেছিল। কোনো আর্থিক মডেলে এই প্রশ্নের ঘর নেই। কোনো বিশ্লেষক, যত দক্ষই হোক, বাইরে থেকে দেখতে পারে না একটা প্রতিষ্ঠানের মূল ইচ্ছা এখনও জীবিত কিনা, নাকি কেবল ফাঁপা কাঠামোটাই রয়ে গেছে, যা এখনও গ্রহণযোগ্য সংখ্যা তৈরি করে চলেছে।

এতে একটা নীরব বৈপরীত্য তৈরি হয়: বিশ্লেষকের বিচার, ঠিক এই কারণে যে তা কেবল মাপা যায় এমন জিনিসের ওপর গড়া, শেষ পর্যন্ত সেই যুক্তিকেই জোরদার করে যাকে এই বই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। যদি একটা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়নে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হয় আয়, মার্জিন, ত্রৈমাসিক বৃদ্ধি, তাহলে প্রতিটা প্রতিষ্ঠান — নিজের উৎসের প্রতি বিশ্বস্ত হোক বা অবিশ্বস্ত — একইভাবে বিচারিত হবে, একই হাতিয়ারে, একই সংখ্যার ভিত্তিতে। বিশ্লেষক, না চেয়েও, পুরো বাজারকে শেখায় কেবল তা-ই দেখতে যা তার মডেল মাপতে পারে, আর মডেলের বাইরে যা কিছু থেকে যায় তা উপেক্ষা করতে — যা প্রায় সবসময় প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে মানবিক আর সবচেয়ে সত্য অংশ।

আরও একটা গতিপ্রকৃতি আছে, কম বলা কিন্তু সমান বাস্তব: বিশ্লেষক কখনও ততটা পুরোপুরি নিরপেক্ষ নয় যতটা তার ভূমিকা তোমাকে বিশ্বাস করাতে চায়। সে প্রায়ই এমন প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করে যাদের সেই একই প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে যাদের সে মূল্যায়ন করে, আরও অনুকূল বিশ্লেষণের বিনিময়ে তথ্যে বিশেষ প্রবেশাধিকার পায়, নিজের পেশাগত সুনাম গড়ে এমন পূর্বাভাসের ওপর যা খুব ঘন ঘন ভুল হলে তার বিশ্বাসযোগ্যতা আর কর্মজীবনের দাম চুকাতে হবে। তার বিচার, প্রযুক্তিগতভাবে যত কঠোরই হোক, সবসময়

জন্মায় এমন এক প্রণোদনা-ব্যবস্থার ভেতরে যা সে যা বিচার করছে তার সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কহীন নয়।

যে বছরের পর বছর প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাইরে থেকে মূল্যায়িত হতে দেখেছে — কখনও অন্যায়ভাবে প্রশংসিত, কখনও অন্যায়ভাবে শাস্তিপ্রাপ্ত — সে জানে যে বিশ্লেষকদের বিচার, একটা শেয়ারের স্বল্পমেয়াদি দামে যত প্রভাবশালীই হোক, কখনও একটা প্রতিষ্ঠানের গভীর সত্য নিয়ে শেষ কথা বলেনি। একটা প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত মূল্যায়ন পেতে পারে যখন সে ইতিমধ্যে নিজের ভেতরে সেই কারণটা হারিয়ে ফেলেছে যে কারণে সে জন্মেছিল। আর একটা প্রতিষ্ঠান ঠান্ডা বা সন্দিগ্ধ মূল্যায়ন পেতে পারে, অথচ এমন এক সারবস্তুতে যা কোনো আর্থিক মডেল মাপতে পারে না, নিজের প্রতি পুরোপুরি বিশ্বস্ত থেকে যেতে পারে।

শেয়ারবাজার ও শেয়ার

শেয়ারবাজারের জন্ম হয়েছিল একটা সরল আর প্রায় মহৎ ভাবনা থেকে: যে কাউকে, শুধু অল্প কয়েকজন প্রতিষ্ঠাতা বা ব্যাংকারকে নয়, একটা ব্যবসার ছোট একটা অংশের মালিক হতে আর তার নিয়তির ভাগীদার হতে দেওয়া। একটা শেয়ার, শুরুতে, এটাই হওয়ার কথা ছিল — এমন এক কাজকর্মের মালিকানায় ঢোকার একটা গণতান্ত্রিক দরজা, যা না হলে বন্ধ থেকে যেত তাদের জন্য যাদের আগে থেকে পুঁজি আর যোগাযোগ ছিল না। একটা শেয়ার কেনা মানে ছিল, তত্ত্বে, একটা প্রতিষ্ঠাতা-ইচ্ছার সহ-অংশীদার হওয়া, নিজের ভাগ যত ছোটই হোক।

কিন্তু শেয়ারবাজার, সময়ের সঙ্গে, শুধু এটা থাকা বন্ধ করল। সে হয়ে উঠল, হয়তো সবার আগে, নিজেই একটা বাজার — এমন এক জায়গা যেখানে শেয়ার কেনাবেচা হয় কোনো ব্যবসায় অংশ নেওয়ার ইচ্ছা থেকে নয়, বরং এক ঘণ্টা, এক দিন, এক সপ্তাহ পরে সেই কাগজের টুকরোর দাম কত হবে সেই হিসাব থেকে। যে শেয়ার একটা কারখানায়, একটা পণ্যে, হাজার হাজার মানুষে আসল অংশীদারত্বের প্রতিনিধি, যারা প্রতি সকালে একটা নির্দিষ্ট কারণে কাজে যায়, সেই একই শেয়ার হয়ে যায় ওঠানামা করা একটা টিকার, যা পড়ে এমন সব অ্যালগরিদম যারা জানে

না, আর জানার দরকারও নেই, সেই প্রতিষ্ঠান আসলে কী তৈরি করে বা কেন জন্মেছিল।

এই বিচ্ছেদ হয়তো গোটা বইয়ের সবচেয়ে মৌলিক: যেকোনো মুহূর্তে একটি শেয়ারের দামের সঙ্গে সেটি যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করে, তার আসল স্বাস্থ্যের প্রায় কোনো সম্পর্কই না থাকতে পারে। দাম বাড়তে পারে একটা গুজবে, একটা ঘোষণায়, বাজারের এমন এক সাধারণ ওঠানামায় যার সঙ্গে ওই নির্দিষ্ট ব্যবসার কোনো যোগ নেই। দাম পড়তে পারে কয়েক শতাংশের জন্য ফসকে যাওয়া একটা পূর্বাভাসে, এমনকি যখন পণ্যটা আগের মতোই একই যত্নে তৈরি হয়ে চলেছে। শেয়ারবাজার মাপে সমষ্টিগত প্রত্যাশা, সারবস্তু নয় — আর ঠিক এই দূরত্বই কেনাবেচা হওয়া শেয়ারকে তার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা আসল প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা একটা জিনিস করে তোলে, কখনও কখনও তার ঠিক উল্টো।

বাজার থেকে কেনা শেয়ারের মালিক প্রায়ই এই দূরত্বের মধ্যে বাঁচেন, টেরও পান না: তিনি মনে করেন প্রতিষ্ঠানের একটা টুকরো তাঁর, আর এক অর্থে কথাটা সত্যি — কিন্তু আরও বাস্তবভাবে, তাঁর হাতে আছে এমন একটা সিকিউরিটি যার মূল্য নির্ভর করে প্রত্যাশা দিয়ে গড়া একটা বাজারের ওপর, সেই সংস্থার ভেতরে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা সংস্থাটির জন্মের কারণের প্রতি রোজ কতটা বিশ্বস্ত, তার ওপর নয়।

শেয়ারবাজারের শেয়ারহোল্ডার, প্রতিষ্ঠাতার মতো নন, প্রায় কখনও কারখানাটা দেখেননি, যিনি উৎপাদন করেন তাঁর সঙ্গে কখনও হাত মেলাননি, এক ত্রৈমাসিক আগে নেওয়া একটা সিদ্ধান্তের আসল ভার কখনও অনুভব করেননি। তিনি কিনেছেন একটা সংখ্যা, যা ওঠে আর নামে, এই আশায় যে নামার চেয়ে বেশি উঠবে।

আর এখানেই বৃত্তটা বন্ধ হয় এই বই এ পর্যন্ত যা কিছু বলেছে তার ওপর: একটা অভিপ্রায় থেকে জন্মানো পণ্য থেকে শুরু করে সেই শেয়ার পর্যন্ত, যা কয়েক সেকেন্ডে কেনাবেচা করে এমন কেউ যে ওই অভিপ্রায়ের কিছুই জানে না। এই বিচ্ছেদের জন্য শেয়ারবাজার দায়ী নয় — সে কেবল সবচেয়ে বিশ্বস্ত আয়না, যা দেখায় শৃঙ্খলের প্রতিটি ধাপে একটি প্রতিষ্ঠানের আদি অর্থ কতটা পাতলা হয়ে যেতে পারে, ধাপে ধাপে, যতক্ষণ না সেটা হয়ে ওঠে একটা দোদুল্যমান সংখ্যা, যা পড়েন

লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাঁরা কখনও জিজ্ঞেস করেননি, আর হয়তো কখনও করবেনও না, সেই প্রতিষ্ঠান আসলে কেন আছে।

শেয়ারহোল্ডাররা যা জানে না

এমন একটা দূরত্ব আছে যা কোনো বার্ষিক প্রতিবেদন, কোনো শেয়ারহোল্ডার সভা, কোনো ত্রৈমাসিক কনফারেন্স কল কখনও সত্যিই মেটাতে পারে না: একজন শেয়ারহোল্ডার একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যা পড়েন, আর সেই প্রতিষ্ঠান আসলে যা, প্রতিদিন, তার ভেতরে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের কাছে — এই দুইয়ের মধ্যে দূরত্ব।

শেয়ারহোল্ডার প্রায় কখনও সেই মানুষটির নাম জানেন না, যিনি এক শুক্রবার সন্ধ্যায় একটা জটিল সমস্যার সমাধান করেছিলেন, কেউ স্পষ্ট করে না বললেও, শুধু এই কারণে যে তাঁর মনে হয়েছিল সমস্যাটার সমাধান হওয়া দরকার। তিনি জানেন না কতবার একজন গ্রাহককে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখা হয়েছে এমন এক মানবিক মূল্যে, যার কথা কোনো অপারেটিং মার্জিন কখনও বলে না। তিনি জানেন না একজন মিডল ম্যানেজার রোজ কতটা আসল ভার বয়ে বেড়ান, অন্য কোথাও ঠিক হওয়া একটা দিকনির্দেশ আর সেই দিকনির্দেশকে বাস্তব পরিশ্রমে রূপ দিতে হবে এমন মানুষদের মাঝখানে আটকে থেকে। এ সবই আছে, ঘটে, নিঃশব্দে প্রতিষ্ঠানের আসল মূল্য গড়ে তোলে — কিন্তু তাঁকে দেখানো কোনো স্লাইডে এর কিছুই কখনও আসে না।

শেয়ারহোল্ডার বেশিরভাগ সময় জানেন না, প্রতিষ্ঠান যে পণ্য বিক্রি করে তা এখনও তার জন্মদাতা অভিপ্রায়ের প্রতি বিশ্বস্ত কি না, নাকি ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছে এমন এক কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার জন্য বারবার তৈরি করা একটা আউটপুট মাত্র, যে কাঠামোকে টিকে থাকতেই হবে। তিনি জানেন না ম্যানেজমেন্ট যখন ছাঁটাই করে বা বিনিয়োগ করে, তখন সেটা করে প্রতিষ্ঠার কারণকে সেবা করতে, নাকি শুধু একটা ত্রৈমাসিক সংখ্যা ঠিকঠাক মেলাতে। তিনি জানেন না মাঠে একজন এজেন্টের গড়ে তোলা আস্থার কতটা, নিচু স্তরের একজন কর্মীর নীরব নিষ্ঠার কতটা, অন্য কোথাও বেছে নিতে পারতেন এমন একজন

গ্রাহকের আনুগত্যের কতটা আসলে ধরে রেখেছে সেই ইমারত, যার মূল্য তিনি দেখেন ওঠানামা করা একটা শেয়ারদরে সংক্ষেপিত।

এই অজ্ঞতা প্রায় কখনও ব্যক্তিগত দোষ নয়। এটা এমন এক ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি, যা ধাপে ধাপে গড়া হয়েছে — পণ্য থেকে পেটেন্ট, ম্যানেজমেন্ট থেকে স্তর, ব্যালান্স শিট থেকে বিশ্লেষক, শেয়ারবাজার থেকে শেয়ার — মানুষ আর অভিপ্রায় দিয়ে তৈরি এক মানবিক, জটিল বাস্তবতাকে এমন এক সংখ্যায় অনুবাদ করতে, যা কয়েক সেকেন্ডে পড়ে ফেলা যায়। এই শৃঙ্খলের প্রতিটি ধাপ মাপা যায় এমন কিছু যোগ করার জন্য সত্যি কিছু একটা সরিয়ে দিয়েছে। আর শেয়ারহোল্ডার, শৃঙ্খলের শেষে, পান কেবল শেষ কড়াটি: একটা দাম, একটা ডিভিডেন্ড, একটা রিটার্ন — প্রায় কখনও দেখেন না সেই সবকিছু, যা পেছনে ফেলে আসতে হয়েছে জিনিসটাকে এত সহজভাবে তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে।

এই বই ঠিক এই দূরত্বের জন্যই লেখা। না-জানার জন্য শেয়ারহোল্ডারকে অভিযুক্ত করতে নয় — তিনি জানতে পারতেন না, কেউ কখনও তাঁকে এই ভাষায় দেখায়নি। বরং তাঁকে দিতে, হয়তো প্রথমবার, তাঁর মালিকানার সংখ্যার পেছনের গোটা শৃঙ্খলটা দেখার সুযোগ: পণ্য, কারখানা, এজেন্ট, কর্মী, মিডল ম্যানেজার, নির্বাহী, ব্যালান্স শিট, বিশ্লেষক, শেয়ারদর। আর সবকিছু একসঙ্গে দেখে, শেষ পর্যন্ত সেই প্রশ্নটা করতে, যা কোনো প্রতিবেদন কখনও তাঁর সামনে রাখেনি: যে জিনিসের একটা অংশের মালিক আমি, সেটা কি এখনও তার জন্মের কারণেই আছে — নাকি আমি না জেনেই শুধু মালিক হয়ে আছি এমন এক অভিপ্রায়ের ছায়ার, যা আমার অনেক আগে অন্য কেউ সত্যিই চেয়েছিল?

অধিগ্রহণ ও বিক্রি

বহু প্রতিষ্ঠানের জীবনে একটা মুহূর্ত আসে, যখন প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় ধীর ক্ষয়ে মরে না, মরে একটা সুনির্দিষ্ট কাজে, একটা নির্দিষ্ট দিনে সেই হওয়া: প্রতিষ্ঠানটা কেনা হয়, বা বিক্রি হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে, যা একটা মানবিক ইচ্ছা থেকে জন্মেছিল তা একটা জিনিসের মতো হাত থেকে হাতে যায় — মূল্যায়িত, দাম-ধরা, দর-কষাকষি করা — আর সেদিন থেকে তা এমন

কারও, যিনি প্রায় সবসময়ই উপস্থিত ছিলেন না যখন সেই ইচ্ছা প্রথম ঠিক করেছিল যে জিনিসটার অস্তিত্ব থাকা উচিত।

একটা অধিগ্রহণের গল্প সবসময় বলা হয় সিনার্জির ভাষায়, বৃদ্ধির ভাষায়, পারস্পরিক সুযোগের ভাষায়। দুটো প্রেস বিজ্ঞপ্তি, একটা সরকারি ছবিতে দুটো হাসি, একটা ঘোষণা যা বলে মিলে যাওয়া দৃষ্টিভঙ্গির কথা আর একসঙ্গে আরও শক্তিশালী ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু এই মার্জিত ভাষার পেছনে প্রায় সবসময় লুকিয়ে থাকে একটা সহজতর, কঠিনতর সত্য: কেউ একজন ঠিক করেছেন যে প্রস্তাবিত দামের মূল্য তাঁরা যা বিক্রি করছিলেন তার ধারাবাহিকতার চেয়ে বেশি। এটা অবশ্যই বিশ্বাসঘাতকতা নয় — কখনও এটা প্রজ্ঞা, কখনও প্রয়োজন, কখনও যা না হলে পুরোপুরি মুছে যেত তাকে বাঁচানোর একমাত্র পথ। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এটা থেকে যায় একটা হস্তান্তর: প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা চলে যায় যিনি তাকে জন্ম দিয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকে এমন কারও কাছে, যিনি বেশিরভাগ সময় সেটা কিনছেন শুধু তা থেকে যতটা মূল্য বের করে আনা যায় তার জন্য।

যিনি একটা প্রতিষ্ঠান কেনেন, তিনি প্রায় সবসময় কেনেন পণ্য, ব্র্যান্ড, গ্রাহক, কারখানা, পেটেন্ট। কিন্তু যত বিস্তারিতই হোক, কোনো চুক্তি দিয়েই তিনি কিনতে পারেন না সেই আদি কারণ, যার জন্য জিনিসটা জন্মেছিল। সেই কারণ, অধিগ্রহণের পরে সংস্থার ভেতরে যাঁরা থেকে যান তাঁরা যদি সচেতনভাবে আগলে না রাখেন, স্রেফ উবে যায় — ক্রেতার কোনো দুরভিসন্ধির জন্য নয়, বরং এই কারণে যে কোনো আইনি দলিল এমন একটা স্মৃতি হস্তান্তর করতে পারে না, যা বেঁচে থাকে কেবল সেই মানুষদের মধ্যে যাঁরা তা নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে যাপন করেছেন।

আর এই সেই মুহূর্ত, যেখানে দেহ-রূপী প্রতিষ্ঠান আর আত্মা-রূপী প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য, যার কথা এই বইয়ের ভূমিকা থেকেই বলা হচ্ছে, সবচেয়ে স্পষ্ট দেখা যায়। দেহ সহজে বিক্রি হয়: তার আছে বাজারমূল্য, আয়ের একটা গুণিতক, একটা ডিউ ডিলিজেন্স যা তাকে খুঁটিনাটি মেপে নেয়। আত্মা, যদি এখনও থাকে, এই মূল্যায়নগুলোর কোনোটাতেই আসে না — আর ঠিক এই কারণেই, প্রায়ই, সইয়ের আগে তাকে খোঁজাও হয় না। দেহ অধিগ্রহণ করা হয়, এই আশায় যে আত্মা

অভ্যাসবশে থেকে যাবে। কিন্তু আত্মা প্রায় সবসময় থাকে কেবল ততদিন, যতদিন তাকে বহন করা মানুষগুলো থাকেন — আর একটা অধিগ্রহণ, তার স্বভাবগতভাবেই, ঠিক সেই মানুষগুলোকে বদলে দিতে চায় নতুন মালিকের সঙ্গে বেশি মিলে যাওয়া অন্যদের দিয়ে।

যিনি একটা অধিগ্রহণ ভেতর থেকে যাপন করেছেন — খবরের কাগজে পড়ে নয়, বরং অনুভব করে করিডরে, সহকর্মীদের মুখে, এমন কারও আকস্মিক নীরবতায় যিনি আর জানেন না আসলে কার কাছে জবাবদিহি করেন — তিনি জানেন সইয়ের দিনটা কখনও সবচেয়ে কঠিন দিন নয়। সবচেয়ে কঠিন দিন আসে পরে, ধীরে, যখন তুমি বুঝতে পারো পণ্যটা একই রয়ে গেছে, ব্র্যান্ডও, গ্রাহকরাও — কিন্তু যে কারণে এই সবকিছু প্রথমে জন্মেছিল, সেটা আর নেই। সে চলে গেছে তাদের সঙ্গে, যারা তাকে মনে রেখেছিল, আর কোনো অধিগ্রহণ চুক্তি কখনও তাকে লেনদেনের অংশ বলে হিসাবে ধরেনি।

বিক্রয় বোর্ড

সেলস বোর্ড বসে প্রায় উপাসনার মতো এক ছন্দে — সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক — একটাই আরাধ্য বস্তুকে ঘিরে: বিক্রির সংখ্যা। এটা সেই ঘর, যেখানে গোটা প্রতিষ্ঠান, তত্ত্বে, এসে মেলে তার সবচেয়ে বাস্তব প্রমাণের দিকে: আমরা কত বিক্রি করেছি, কত বিক্রি করব, পরের বৈঠকের আগে ওই সংখ্যা বাড়াতে কী করতে হবে।

এই ঘরে, প্রতিষ্ঠানের এ পর্যন্ত বলা প্রতিটি অংশের তুলনায় ভাষা বদলে যায়। প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ের কথা আর হয় না, পণ্য কেন জন্মেছিল তার কথা নয়, বাকি সবকিছুকে প্রাণ দেওয়া ইচ্ছার কথা নয়। কথা হয় পাইপলাইনের, ফোরকাস্টের, মেটাতে হবে এমন ঘটতির, কভার করতে হবে এমন এলাকার, মাস শেষের আগে চূড়ান্ত করতে হবে এমন গ্রাহকের। এটা একটা দক্ষ, সরাসরি ভাষা, তার তাড়ায় প্রায় সামরিক — আর ঠিক এই কারণেই, বৈঠকের পর বৈঠকে, ভুলিয়ে দিতে পারে যে আলোচিত প্রতিটি সংখ্যার পেছনে আছেন আসল এজেন্ট, আসল কর্মী, আসল গ্রাহক, প্রত্যেকের নিজের গল্প নিয়ে, যা বোর্ড কাজের প্রয়োজনে একটা টেবিলের একটা লাইনে নামিয়ে আনে।

সেলস বোর্ড বাঁচে এক বিশেষ চাপের মধ্যে: এটাই সেই বিন্দু, যেখানে শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি, ওপরতলায় তৈরি পরিকল্পনায় আলোচিত, মাঠে বাস্তব কাজে রূপ নিতে বাধ্য, প্রায়ই বাজারের বাস্তবতা যতটা সময় দিত তার চেয়ে অনেক কম সময়ে। আগের ত্রৈমাসিক যদি দশ শতাংশ বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে, সেলস বোর্ডের এই বিলাসিতা নেই যে জিজ্ঞেস করবে ওই দশ শতাংশের কোনো মানে ছিল কি না: যে কোনো উপায়ে, যা লাগে তাই করে, সেটা অর্জন করার পথ তাকে খুঁজতেই হবে — নতুন প্রমোশন, এজেন্টদের ওপর চাপ, মার্জিন খেয়ে ফেলা ডিসকাউন্ট, এমন গ্রাহকদের ওপর ঠেলা যাঁরা হয়তো এখনও অতটা কেনার জন্য তৈরি ছিলেন না।

এতে তৈরি হয় এক নীরব বিকৃতি, ঘরের ভেতরে খুব কম জনই যা খোলাখুলি স্বীকার করেন: সেলস বোর্ড ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করা বন্ধ করে দেয় বাজারের আসলে কী দরকার, আর জিজ্ঞেস করতে শুরু করে কেবল অন্য কোথাও আগেই প্রতিশ্রুত সংখ্যায় কীভাবে পৌঁছানো যায়। প্রশ্নের দিক উল্টে যায় — যা দরকার তা আর বিক্রি করা হয় না, মরিয়া হয়ে খোঁজা হয় এমন কাউকে, যে কিনতে পারে যা বিক্রি হবে বলে আগেই ঠিক হয়ে গেছে। এটা সেই একই কৌশল, যা আগেই দেখা গেছে সেই কারখানায় যেটা উৎপাদন করে যা আগেই বিক্রি হয়ে গেছে, শুধু এক ঘর এগিয়ে আনা, সেই জায়গায় যেখানে ওই বিক্রি এখনও কেবল একটা প্রতিশ্রুতি এবং যে কোনো মূল্যে তাকে বাস্তব করতে হবে।

যিনি বছরের পর বছর এই ঘরগুলোয় বসেছেন — সংখ্যা জানিয়েছেন, ঘাটতির কৈফিয়ত দিয়েছেন, এমন এক ফাঁক মেটাতে নতুন উপায় প্রস্তাব করেছেন যা আগের মাসে ছিলই না — তিনি জানেন সেলস বোর্ড, তার সেরা রূপে, হওয়া উচিত সেই জায়গা যেখানে প্রতিষ্ঠান তার আসল বাজারের কথা সবচেয়ে মন দিয়ে শোনে। আর জানেন যে বড্ড বেশিবার, তার বদলে, সেটা হয়ে ওঠে সেই জায়গা যেখানে প্রতিষ্ঠান শেখে আসল বাজারকে বাঁকিয়ে অন্য কোথাও আগেই ঠিক হওয়া একটা সংখ্যায় ঢোকাতে, বাজারকেই জিজ্ঞেস করার কষ্টটুকু কেউ করার আগেই যে সে আসলে কী চেয়েছিল।

ফেরার আর পথ নেই যেখানে

প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, যা ধীরে ধীরে তার প্রতিষ্ঠার কারণ হারাচ্ছে, তার জীবনে একটা মুহূর্ত আছে যা কোনো ক্যালেন্ডারে দাগানো থাকে না, কোনো দলিলে লেখা থাকে না — অথচ তা আছে, একটা তারিখের মতোই নিখুঁত, যদিও ঘটার সময় কেউ তাকে চেনে না। এটা সেই মুহূর্ত, যখন কাঠামোটা আর ফিরে যেতে পারে না। কেউ এমন ঠিক করেছে বলে নয়। বরং স্রেফ এই কারণে যে, যে পথ থেকে সে শুরু করেছিল তা ভালো করে মনে রাখার মতো আর কেউ বাকি নেই।

সেই বিন্দু পর্যন্ত প্রতিটি বিচ্যুতি এখনও ফেরানো যায়। একটা ভুল ছাঁটাই শোধরানো যায়। পথ হারানো একটা ম্যানেজমেন্টকে ফিরিয়ে আনতে পারেন যিনি এখনও মনে রেখেছেন। একটা বিকৃত পণ্য, যথেষ্ট ইচ্ছা থাকলে, ফিরে যেতে পারে তার আদি অভিপ্রায়ে। যতক্ষণ সংস্থার ভেতরে কোথাও অন্তত একজন মানুষও আছেন যিনি জীবন্ত বহন করছেন কেন-র স্মৃতি — এখনও উপস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠাতা, বহুদিনের কোনো কর্মী, এমনকি আগে কেমন ছিল মনে রাখা কোনো বিশ্বস্ত গ্রাহক — ফেরার পথ খোলা থাকে, যত সরুই হোক।

ফেরার পথ ফুরিয়ে যায় যখন সেই শেষ মানুষটি চলে যান, আর যাওয়ার আগে তাঁর কাছ থেকে কেউ সেই একই স্মৃতি পায়নি। ফুরিয়ে যায় যখন প্রতিষ্ঠাতাকে চিনতেন এমন শেষ নির্বাহী অবসর নেন, যাঁরা থেকে যাচ্ছেন তাঁদের কখনও না বলেই যে প্রতিষ্ঠানটা কেন জন্মেছিল। ফুরিয়ে যায় যখন প্রথম পণ্যটা — অপূর্ণ, কিন্তু সত্যি — মনে রাখা শেষ কর্মী জায়গা ছেড়ে দেন এমন কাউকে, যিনি কেবল চিনেছেন আগেই-ঘষামাজা, আগেই-অপ্টিমাইজ-করা, আগেই-উৎস-থেকে-দূরে-সরে-যাওয়া সংস্করণটা। সেই মুহূর্ত থেকে প্রতিষ্ঠান টিকে থাকে — উৎপাদন করে, বিক্রি করে, ডিভিডেন্ড দেয় — কিন্তু চিরকালের জন্য হয়ে গেছে অন্য কিছু। একটা নিখুঁতভাবে চলা দেহ, যা হারিয়েছে, কোনো শোক ছাড়াই কারণ কোনো স্মৃতি বাকি নেই, সেই আত্মাকে যা তাকে প্রথম চালিয়েছিল।

এই কারণেই প্রতিটি সংস্থায় স্মৃতি কোনো ভাবাবেগের বিলাসিতা নয়, বরং অপরিবর্তনীয়ের বিরুদ্ধে একমাত্র সত্যিকারের রক্ষাকবচ। একটা

প্রতিষ্ঠান সইতে পারে বছরের পর বছর ভুল, ভুল ছাঁটাই, উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে থাকা ম্যানেজমেন্ট — সে নিজেকে শোধরাতে পারে, যদি পথটা মনে রাখার মতো কেউ থেকে যান। কিন্তু তার প্রতিষ্ঠার স্মৃতি পুরোপুরি হারিয়ে গেলে সে বাঁচতে পারে না। সেদিন, কেউ ঘোষণা না করলেও, সংখ্যাগুলো আগের মতোই নিয়ম করে প্রকাশ হতে থাকলেও, কিছু একটা চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেছে।

যিনি এই বিন্দুকে কাছে আসতে দেখেছেন — নিজের প্রতিষ্ঠানে, কিংবা সারা জীবন ধরে বাইরে থেকে দেখা অন্যদের মধ্যে — তিনি চেনেন একটা সহজ সংকেত, তার স্পষ্টতায় প্রায় সাধারণ: সেই দিন, যেদিন কোনো ঘরে, পিরামিডের কোনো স্তরে, কেউ আর জিজ্ঞেস করে না এই জিনিসটা কেন আছে। সেই নীরবতা, কোনো লোকসানি ব্যালান্স শিট নয়, পড়তে থাকা কোনো শেয়ারদর নয়, এটাই আসল চিহ্ন যে ফেরার পথের শেষ সীমা আগেই পেরিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর সেদিন থেকে প্রতিষ্ঠান যা কিছু করে — যত দক্ষই হোক, যত লাভজনকই হোক — তা হবে কেবল এমন এক দেহের জড় চলন, যে কিছুকাল আগেই জানা বন্ধ করে দিয়েছে কেন সে চলে।

স্টাইল ও আভিজাত্য: উদ্যোগে উদ্যোগে তফাত

এমন প্রতিষ্ঠান আছে যারা সংখ্যায় একে অপরের মতো, অথচ সারবস্তুতে আকাশপাতাল তফাত। একই রাজস্ব, একই খাত, কাগজে-কলমে একই আকার — অথচ যিনি তাদের ভেতর দিয়ে হাঁটেন, একটা দিনের জন্য হলেও, সঙ্গে সঙ্গে টের পান এমন এক পার্থক্য যা কোনো ব্যালান্স শিট মাপতে পারে না। এই পার্থক্যের একটা পুরোনো নাম আছে, সমকালীন ম্যানেজমেন্টের ভাষায় প্রায় সেকেলে: একে বলে স্টাইল। আর তার বিরলতম রূপ, যা গড়া সবচেয়ে কঠিন আর হারানো সবচেয়ে সহজ, তাকে বলে আভিজাত্য।

একটি প্রতিষ্ঠানের স্টাইল তার লোগো নয়, তার বিজ্ঞাপনের সুর নয়, এমনকি তার পণ্যের বস্তুগত গুণমানও নয়। এটা সেই ধরন, যেভাবে ওই সংস্থা এমন জিনিসকে, যাকে সে অযত্নে সামলাতে পারত, বেছে নেয় যত্নে সামলাতে। এটা সেই সরবরাহকারী, যাঁকে সময়মতো টাকা দেওয়া

হয় এমনকি আইন দেবির অনুমতি দিলেও। এটা সেই গ্রাহক, যার কথা পুরোটা শোনা হয় এমনকি অভিযোগটা কোনো তাৎক্ষণিক বিক্রি আনবে না জেনেও। এটা সেই খুঁটিনাটি, যার যত্ন নেওয়া হয় এমনকি যখন কেউ, সম্ভবত, কখনও খেয়ালই করবে না। স্টাইল বাঁচে সেই সিদ্ধান্তগুলোয় যা কোনো সূচক মাপে না, যা নেওয়া হয় যখন কেউ দেখছে না।

আভিজাত্য হল সেই স্টাইল, যা সময় আর কঠিন পরিস্থিতির পরীক্ষায় উত্তরে গেছে। যেকোনো প্রতিষ্ঠান স্টাইল দেখাতে পারে যখন সব ঠিকঠাক চলছে, যখন মার্জিন চওড়া আর গ্রাহকরা খুশি। আভিজাত্য দেখা যায় যখন সব খারাপ চলে: একটা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ছাঁটাই কীভাবে সামলায় তাতে, নিজের কোনো দোষ ছাড়াই যাকে সংস্থা ছাড়তে হচ্ছে তাঁর সঙ্গে কেমন আচরণ করে তাতে, নিজের ভুলকে একটা সুলিখিত প্রেস বিজ্ঞপ্তির পেছনে লুকোনোর বদলে কীভাবে স্বীকার করে তাতে। আভিজাত্য হল সেই স্টাইল, যা ধরে রাখা হয় যখন তা ধরে রাখতে সত্যিকারের কিছু খরচ হয় — সময়, টাকা, অহংকার।

আর এখানেই দেখা দেয় আপাতদৃষ্টিতে সমান দুটো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ পার্থক্য: একটা, চাপের মুখে, প্রকাশ করে ফেলে যে সে তার স্টাইল গড়েছিল কেবল এমন এক কাঠামোর ওপর রঙের প্রলেপ হিসেবে যা কখনও সত্যিই তাকে ধারণ করেনি — আর প্রথম আসল বিপদেই রং উঠে যায়, বেরিয়ে পড়ে সেই একই নির্মম যুক্তি যা কেবল সংখ্যার কথা ভাবা যেকোনো কাঠামোর। অন্যটা, একই চাপে, আবিষ্কার করে যে তার ভিত্তি সত্যিই ছিল সেই যত্ন যা কেবল প্রসাধনী মনে হত — আর সে তা ধরে রাখে, খরচ হলেও, এমনকি যখন কোনো বাইরের বিশ্লেষক ত্রৈমাসিকের ব্যালান্স শিটে তাকে এর জন্য কোনো কৃতিত্বই দেবেন না।

যিনি জীবনভর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন, তিনি এই পার্থক্য চিনতে শেখেন কোনো ব্যালান্স শিটে লেখা দেখার অনেক আগেই। তিনি তা টের পান প্রথম দিনে তাঁকে কীভাবে স্বাগত জানানো হয় তাতে। টের পান সরল বিশ্বাসে করা একটা ভুলের সঙ্গে কেমন আচরণ করা হয় তাতে। টের পান, সবচেয়ে বেশি, যার আর তাকে দেওয়ার কিছু নেই তার প্রতি প্রতিষ্ঠান কেমন আচরণ করে তাতে — বয়স হয়ে যাওয়া একজন

কর্মী, আর কিনবেন না এমন একজন গ্রাহক, শিগগিরই বদলে দেওয়া হবে এমন একজন সরবরাহকারী। ঠিক সেই মুহূর্তগুলোয়, যখন সুবিধা আর যত্ন দাবি করে না, তখনই দেখা যায় একটা প্রতিষ্ঠানের সত্যিই আভিজাত্য আছে কি না, নাকি তার ছিল কেবল, কিছুকালের জন্য, আভিজাত্যপূর্ণ দেখানোর স্টাইল।

মুনাফা

মুনাফা হয়তো গোটা কর্পোরেট শব্দভান্ডারে সবচেয়ে ভুল বোঝা শব্দ — এটা দুর্বোধ্য বলে নয়, বরং এই কারণে যে বড় বেশি মানুষ একে এমনভাবে দেখেন যেন এটা একটা লক্ষ্য, অথচ এটা সবসময়ই, তার সবচেয়ে সৎ স্বভাবে, কেবল একটা পরিণাম।

একটা প্রতিষ্ঠান মুনাফা করার জন্য জন্মায় না, ঠিক যেমন একজন মানুষ শ্বাস নেওয়ার জন্য জন্মায় না। মানুষ শ্বাস নেয় বাঁচার জন্য, শ্বাস নেওয়ার জন্য বাঁচে না। মুনাফা একটা সংস্থার শ্বাস: দরকারি, প্রাণদায়ী, তার অভাবে অল্প সময়েই মৃত্যু আসে — কিন্তু সুস্থ অবস্থায় কেউ সকালে ঘুম থেকে উঠে ভাবে না যে তার দিনের উদ্দেশ্য শ্বাস নেওয়া। মানুষ এটা করে কারণ এটা অন্য কিছুর কাজে লাগে। যেদিন একটা প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার জন্য মুনাফা করার বদলে মুনাফা করার জন্য টিকে থাকতে শুরু করে, সেদিন জরুরি কিছু একটা ইতিমধ্যেই উল্টে গেছে।

এই উল্টে যাওয়া ঘটার সময় প্রায় টেরই পাওয়া যায় না, কারণ ভাষা বদলায় না: লোকে পণ্যের কথা, গ্রাহকের কথা, মিশনের কথা বলে চলে। কিন্তু সিদ্ধান্তগুলো, নিঃশব্দে, একটাই প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করে — এতে মুনাফা বাড়ে না কমে — আদি প্রশ্নটার বদলে: এটা কি এখনও সেই কারণের কাজে লাগে যার জন্য আমরা জন্মেছিলাম। মুনাফা, ভালোভাবে করা কাজের পরিণাম থেকে, হয়ে ওঠে সেই মাপকাঠি যা ঠিক করে কাজটা আদৌ করার মতো কি না। আর মাপকাঠি যখন লক্ষ্য হয়ে যায়, বাকি সবকিছু — মানুষ, গুণমান, সময়, যত্ন — নিজস্ব মূল্য হারিয়ে কেবল একটা অধীন মূল্য পেতে শুরু করে: শেষ সংখ্যায় তা কতটা অবদান রাখে।

অথচ মুনাফা, তার বিশুদ্ধতম রূপে, কখনও সেই শত্রু ছিল না যার কথা এই বই বলে। যে প্রতিষ্ঠান মুনাফা করে না সে মরে যায়, আর তার সঙ্গে মরে যায় সেই প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়, যা সেবা করে যেতে চাইত। সৎ মুনাফা — যা আসে ভালোভাবে তৈরি একটা পণ্য থেকে, ন্যায্য দামে বিক্রি, এমন মানুষদের কাছে যাঁরা তা থেকে আসল মূল্য পান — সবচেয়ে বাস্তব প্রমাণ যে একটা অভিপ্রায় সময়ের সঙ্গে নিজেকে টিকিয়ে রাখার পথ খুঁজে পেয়েছে। এটা দোষ নয়। যখন এই শিকড় থেকে উঠে আসে, তখন এটা প্রায় আশীর্বাদ: এই সমর্থন যে ঠিক কাজ করা আর টিকে থাকা অবশ্যই দুটো বিপরীত পথ নয়।

মুনাফার দুই রূপের পার্থক্য — যেটা এখনও শ্বাস, আর যেটা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য হয়ে গেছে — কোনো ব্যালান্স শিটে কখনও দেখা যায় না, কারণ সংখ্যাটা, আলাদা করে দেখলে, দুই ক্ষেত্রেই এক। দেখা যায় কেবল তখন, যখন তুমি উজানে তাকাও: তা পেতে কী বিসর্জন দেওয়া হয়েছে, আর ওই সংখ্যা না এলে কী বিসর্জন দেওয়া হত। যে প্রতিষ্ঠান নিজের পণ্যের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার চেয়ে একটু মুনাফা হারাতে রাজি, তার এখনও কোথাও আছে সেই আত্মা যার কথা এই বই বলে। যে প্রতিষ্ঠান মার্জিনের এক পয়েন্ট হারানোর চেয়ে যেকোনো কিছু — মানুষ, গুণমান, প্রতিশ্রুতি — বিসর্জন দিতে রাজি, সে কিছুকাল আগেই বাঁচার জন্য শ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। সে শুরু করেছে, কাউকে না বলে, কেবল শ্বাস নেওয়ার জন্য বাঁচতে।

কর্পোরেট পতন

বাইরে থেকে দেখলে একটা প্রতিষ্ঠানের পতন সবসময় আকস্মিক মনে হয়। শেয়ারের দাম হুড়মুড় করে পড়ে যায়, দেউলিয়া ঘোষণা হয়, হাজার হাজার মানুষ একদিনেই জানতে পারে যে তাদের আর চাকরি নেই। খবরের কাগজ পতনটাকে বলে একটা ঘটনা হিসেবে — একটা নির্দিষ্ট তারিখ, কোনো আগাম সতর্কতা ছাড়াই এসে পড়া একটা খবর। কিন্তু যে এই মুহূর্তগুলো ভেতর থেকে কাটিয়েছে, সে অন্য কিছু জানে, আর সেটা আরও অস্বস্তিকর: পতন কখনও সেই দিন আসে না যেদিন তার ঘোষণা হয়। সে আসে অনেক আগে, নিঃশব্দে, আর ঘোষণার সেই দিনটা কেবল

সেই মুহূর্ত, যখন ততদিনে অসহনীয় হয়ে ওঠা বাস্তবতাকে আর লুকিয়ে রাখা যায় না।

কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখলে প্রতিটি কর্পোরেট পতন ভিন্ন ভিন্ন রূপে একই গল্প বলে: এটা কখনও বিনা মেঘে বজ্রপাত ছিল না, এটা সবসময়ই ছিল এক ধীর রক্তক্ষরণ, যা প্রতিষ্ঠানের ভেতরের কেউ বহু বছর আগেই আসতে দেখেছিল — কোনো কর্মী, যে টের পেয়েছিল মান পড়ে যাচ্ছে; কোনো এজেন্ট, যে অনুভব করেছিল এলাকাটা ঠান্ডা হয়ে আসছে; মাঝারি স্তরের কোনো ম্যানেজার, যে দেখেছিল একই ভুল সিদ্ধান্ত ত্রৈমাসিকের পর ত্রৈমাসিক ফিরে ফিরে আসছে। এই কণ্ঠগুলো প্রায় সবসময়ই থাকে। সমস্যা কখনও তাদের অনুপস্থিতি নয়। সমস্যা হল, যে কাঠামো ইতিমধ্যেই তার প্রতিষ্ঠার কারণ হারিয়ে ফেলেছে, তার ভেতরে এই কণ্ঠগুলো আর এমন কাউকে খুঁজে পায় না যে পুরোটা শুনতে রাজি — কারণ শুনতে গেলে থামতে হয়, আর থামা এমন একটা ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না, যা ত্রৈমাসিকের পর ত্রৈমাসিক দৌড়ে চলার জন্যই তৈরি।

এই অর্থে পতন কখনও কারণ নয়। এটা কেবল ফেরার পথ না থাকা সেই বিন্দুর শেষ, দৃশ্যমান পরিণতি, যার কথা এই পাতাগুলোতে আগেই বলা হয়েছে — সেই মুহূর্ত, যখন প্রতিষ্ঠার কারণের শেষ স্মৃতিটুকু চলে গেল, আর কেউ সময়মতো টের পেল না যে এরপর যা আসবে তা থামতে হবে। সেই বিন্দু আর প্রকাশ্য পতনের মাঝে কেটে যেতে পারে বহু বছর — এমন বছর, যখন প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করে চলে, বিক্রি করে চলে, এমনকি ডিভিডেন্ডও দেয়, অথচ উপরিতলের নিচে যা কিছু সত্যিই তাকে ধরে রেখেছিল, সব ততদিনে ফাঁপা হয়ে গেছে।

আর এখানেই লুকিয়ে আছে এই পুরো যাত্রার শেষ, সবচেয়ে তিক্ত সত্য: পতনের মুহূর্তে সবচেয়ে বড় দামটা প্রায় কখনওই তারা দেয় না, যারা সেই পতন ঘটানো সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছিল। যে এক্সিকিউটিভ ভুল ছাঁটাইয়ের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি বিদায় নেন মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ নিয়ে। যে বিশ্লেষক শেয়ারটার দাম বাড়িয়ে ধরেছিলেন, তিনি স্ট্রেক নিজের পূর্বাভাস বদলে পরেরটায় চলে যান। যে শেয়ারহোল্ডার সময়মতো বেচে দিয়েছিলেন, তিনি লাভ নিয়ে সরে পড়েন। যারা থেকে যায়, প্রায় সবসময়ই, তারা কর্মী, এজেন্ট, সরবরাহকারী — সেই

মানুষেরা, যারা আসল সারবস্তুর সবচেয়ে কাছে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থেকে সবচেয়ে দূরে, আর যারা মাস বা বছর আগেই সবার আগে জানত যে কিছু একটা ঠিক নেই।

যে একটা পতন কাছ থেকে দেখেছে — খবরের কাগজে পড়েনি, বরং করিডরে, সহকর্মীদের মুখে, এমন এক অফিসের হঠাৎ নীরবতায় তা বেঁচে থেকেছে, যে অফিস কিছুদিন আগেও অবিনাশী মনে হত — সে নিজের সঙ্গে বয়ে বেড়ায় এমন এক প্রশ্ন, যার পুরো উত্তর কোনো ময়নাতদন্তমূলক বিশ্লেষণ কখনও দেয় না: যদি কেউ, যথেষ্ট উঁচুতে বসে, যথেষ্ট আগে, সেই কণ্ঠগুলো শুনত যারা আগে থেকেই জানত — তাহলে হয়তো কেবল এটুকু মনে রাখাই কি যথেষ্ট হত না, যে প্রতিষ্ঠানটা কেন জন্মেছিল?

বাছাই ও সিদ্ধান্ত

এই বইয়ের প্রতিটি পাতা এ পর্যন্ত বলেছে, কীভাবে একটা ভালো উদ্দেশ্য হারিয়ে যেতে পারে — ধাপে ধাপে, ঘর থেকে ঘরে, সংখ্যা থেকে সংখ্যায়। কিন্তু তোমাকে এটা বিশ্বাস করতে দেওয়া অসং হবে যে এই পথ অনিবার্য, এমন এক প্রাকৃতিক নিয়ম, যা থেকে কোনো প্রতিষ্ঠান রেহাই পায় না। তা নয়। কারণ এই শৃঙ্খলের প্রতিটি ধাপে — পণ্য, দাম, ম্যানেজমেন্ট, ব্যালান্স শিট, সেলস বোর্ড — শেষ পর্যন্ত সবসময় একজন মানুষ থাকে, যে বাছাই করে। আর যেখানে বাছাই আছে, সেখানে এই সম্ভাবনাও আছে যে সবকিছু অন্যভাবে ঘটতে পারত।

একটা সিদ্ধান্ত আর নিছক একটা প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তফাতটা যতটা মনে হয় তার চেয়ে সূক্ষ্ম, আর যতটা ভাবা যায় তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিক্রিয়া সাড়া দেয় কেবল মুহূর্তের চাপে: শেষ হয়ে আসা ত্রৈমাসিক, প্রতিযোগীর চাল, যে সংখ্যাটা মিলছে না। সে দ্রুত, স্বয়ংক্রিয়, প্রায় সবসময়ই তাড়াতাড়ির দোহাই দিয়ে তাকে ন্যায্য ঠিক করা যায়। সিদ্ধান্ত, উল্টো দিকে, কাজ করার আগে এক মুহূর্ত থামে আর সেই প্রশ্নটা করে, যা এই বই প্রতিটি অধ্যায়ে বারবার করেছে: এই পদক্ষেপ কি আমাদের সেই কারণের কাছে নিয়ে যায়, যার জন্য এই সব কিছুর জন্ম হয়েছিল, নাকি তার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়? সেই বিরতি, যত ছোটই হোক,

একমাত্র জায়গা, যেখানে মানুষের ইচ্ছা সত্যিই আবার প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠে, যে কাঠামোর সেবা তার করার কথা, তার টানে ভেসে না গিয়ে।

গুরুত্ব পেতে হলে প্রতিটি বাছাইকে বীরত্বপূর্ণ হতে হয় না। একটা প্রতিষ্ঠানের আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখে যে সিদ্ধান্তগুলো, তার বেশিরভাগই ছোট, প্রায় অদৃশ্য: সরবরাহকারীকে সময়মতো টাকা দেওয়া, এমনকি যখন দেরি করা যেত; গ্রাহকের কথা শোনা, এমনকি যখন তাতে তক্ষুনি কোনো বিক্রি হবে না; সহকর্মীর পক্ষ নেওয়া, এমনকি যখন চূপ করে থাকটা বেশি আরামের। এই বাছাইগুলোর কোনোটাই একটা ত্রৈমাসিক ব্যালান্স শিট বদলায় না। কিন্তু সময়ের সঙ্গে যোগ হতে হতে এগুলোই ঠিক সেই জিনিস, যা আলাদা করে দেয় এমন প্রতিষ্ঠানকে, যার এখনও আত্মা আছে, সেই প্রতিষ্ঠান থেকে, যে ভুলেই গেছে যে কখনও তার আত্মা ছিল।

একটা দায়িত্ব আছে, যা এই বই সমান ওজনে চাপিয়ে দেয় যেকোনো কাঠামোর শীর্ষে যে আছে আর তলায় যে আছে, দুজনের ওপরেই: নড়াচড়ার জায়গা যত ছোটই হোক, কেউই কখনও পুরোপুরি বাছাইহীন নয়। একজন এক্সিকিউটিভ বাছাই করতে পারেন, একটা প্রয়োজনীয় ছাঁটাইয়ের কথা কীভাবে জানাবেন। একজন কর্মী বাছাই করতে পারে, এমন একটা কাজে কতটা যত্ন ঢালবে, যা কেউ কখনও কাছ থেকে যাচাই করবে না। একজন শেয়ারহোল্ডার বাছাই করতে পারেন, তিনি সত্যিই কীসের মালিক তা জেনে নেবেন, শুধু দাম ওঠানামা দেখার বদলে। এই বাছাইগুলোর কোনোটাই একা একটা প্রতিষ্ঠানকে বাঁচায় না। কিন্তু এদের অনুপস্থিতি, যথেষ্ট মানুষ যথেষ্ট দিন ধরে বারবার করলে, ঠিক সেই কলকবজা, যা নিয়ে যায় ফেরার পথ না থাকা সেই বিন্দুতে, যার কথা আগেই বলা হয়েছে।

যে কোনো কাঠামোর ভেতরে এত দিন কাটিয়েছে যে কঠিন সময়গুলোতেও তাকে টিকে থাকতে দেখেছে, সে এমন কিছু জানে, যা কোনো ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়াল যথেষ্ট স্পষ্ট করে শেখায় না: একটা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার কারণ বোর্ডরুমে লেখা কোনো কৌশল দিয়ে রক্ষা হয় না। তা রক্ষা হয়, দিনের পর দিন, সেই শত শত ছোট বাছাইয়ে, যা প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি স্তরে, তখন করে যখন কেউ দেখছে না। ঠিক

সেখানেই, যা করা বেশি আরামের আর যা উৎসের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, তার মাঝের সেই ছোট্ট, প্রাত্যহিক জায়গায়, সত্যিই ঠিক হয় একটা প্রতিষ্ঠান এখনও টিকে থাকার যোগ্য কি না।

ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি বদলায়

আজকের কাজের জগতের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে এক নিঃশব্দ চলাচল, এতটাই স্বাভাবিক যে তা আর উল্লেখ করার যোগ্যই মনে হয় না: ম্যানেজমেন্ট এক প্রতিষ্ঠান থেকে আরেক প্রতিষ্ঠানে যায় এমন সাবলীলতায়, যা অন্য কোনো কর্পোরেট চরিত্রের একইভাবে নেই। যে এক্সিকিউটিভ বছরের পর বছর একটা খাদ্য কোম্পানি চালিয়েছেন, তিনি কয়েক মাসের মধ্যে নিজেকে একটা ওষুধ কোম্পানি চালাতে দেখতে পারেন, তারপর একটা প্রযুক্তি কোম্পানি, তারপর একটা আর্থিক কোম্পানি — সঙ্গে নিয়ে একই পদ্ধতি, সূচক আর লক্ষ্যের একই ভাষা, যা প্রয়োগ হয় এমন বিষয়বস্তুর ওপর, যা তিনি প্রতিবার আরও কম গভীরভাবে বোঝেন।

এই চলাচলের জন্ম একটা নির্দিষ্ট বিশ্বাস থেকে, যা আজ ম্যানেজমেন্ট স্কুলগুলোতে প্রায় প্রশ্রীত: ম্যানেজমেন্ট একটা আড়াআড়ি দক্ষতা, যে বিষয়ের ওপর তা প্রয়োগ হয় তা থেকে আলাদা করা যায়। বলা হয়, তুমি কী পরিচালনা করছ তা নির্বিশেষে ভালোভাবে পরিচালনা করা যায় — মানুষ, প্রক্রিয়া, বাজেট, লক্ষ্য সর্বজনীন শ্রেণি, আর যে এগুলো আয়ত্ত করেছে, সে যেকোনো খাতে একই ফল নিয়ে এগুলো প্রয়োগ করতে পারে। এটা এক লোভনীয়, দক্ষ ধারণা, আর আংশিক সত্যিও। কিন্তু এর একটা দাম আছে, যা কদাচিৎ মাপা হয়: যে সিদ্ধান্ত নেয় আর সে যা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তার আসল সারবস্তুর মধ্যে বেড়ে চলা দূরত্ব।

যে এক্সিকিউটিভ কয়েক বছর অন্তর কোম্পানি বদলান, তিনি কখনও সময় পান না নিজের নেতৃত্বে থাকা কোনো প্রতিষ্ঠানের গভীর প্রতিষ্ঠার কারণ আত্মস্থ করার। তিনি আসেন, সংখ্যাগুলো পড়েন, অন্য জায়গায় ইতিমধ্যে প্রয়োগ করা পদ্ধতিটা প্রয়োগ করেন, নিজের মেয়াদের সময়সীমার মধ্যে একটা মাপা যায় এমন ফল দেখান, আর তাঁর সিদ্ধান্তগুলোর ধীর পরিণতি পুরোপুরি প্রকাশ পাওয়ার আগেই এগিয়ে

যান। যারা সেই পরিণতি কুড়োতে থেকে যায় — কর্মী, মাঝারি স্তরের ম্যানেজার, গ্রাহক, সরবরাহকারী — সিদ্ধান্তে তাদের কখনও কোনো কথা বলার সুযোগ ছিল না, আর যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছিল, যে এখন অন্য কোথাও, অন্য কিছু চালাচ্ছে, তাকে তা বলার সুযোগও প্রায় নিশ্চিতভাবেই তারা কখনও পাবে না।

এতে স্মৃতির সেই শৃঙ্খলে এক নিঃশব্দ ফাটল তৈরি হয়, যার কথা এই বই তার প্রথম পাতা থেকেই বলে আসছে: যদি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি বদলায় একটা প্রতিষ্ঠান তার প্রতিষ্ঠার কারণ বদলানোর চেয়ে দ্রুত, তাহলে সেই কারণ পাহারা দিতে কে থাকে? সেটা ম্যানেজমেন্ট নিজে হতে পারে না, সংজ্ঞা অনুযায়ীই যে সবসময় ক্ষণিকের অতিথি। সেটা অবশ্যই অন্য কেউ — যে বেশি দিন থাকে, যে উৎসটা বেঁচে থেকেছে, যে সেই জিনিসটা কেন জন্মেছিল তার স্মৃতি বয়ে বেড়ায় নিজের শরীরে, শুধু নিজের জীবনবৃত্তান্তে নয়। কিন্তু ক্রমশ, এই মানুষদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই। সেই ক্ষমতা আছে কেবল তার, পেশার নিয়মেই যে ক্ষণিকের অতিথি।

যে নিজের প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে একের পর এক ভিন্ন এক্সিকিউটিভকে চলে যেতে দেখেছে, প্রত্যেকে এক নতুন পদ্ধতি নিয়ে, প্রত্যেকে নিজের সর্বজনীন কার্যকারিতায় নিশ্চিত, সে এক তিক্ত কিন্তু মূল্যবান শিক্ষা পায়: পরিচালনার দক্ষতা, যত বাস্তবই হোক আর যত প্রয়োজনীয়ই হোক, যা পরিচালনা করা হচ্ছে তার অন্তরঙ্গ জ্ঞানের জায়গা কখনও নেয় না। যে প্রতিষ্ঠান তার প্রতিষ্ঠাকালীন স্মৃতি তুলে দেয় কেবল তার হাতে, যার কেরিয়ারের কাঠামোই তাকে কয়েক বছরের মধ্যে চলে যাওয়ার দিকে ঠেলে দেয়, সে প্রকাশ্যে না বলেও ইতিমধ্যে বাছাই করে ফেলেছে নিজের ভবিষ্যৎ এমন কারও হাতে তুলে দিতে, যে নিজের সিদ্ধান্তের জবাব দেওয়ার মতো যথেষ্ট দিন কখনও উপস্থিত থাকবে না।

ক্ষমতা আর টাকা ছাড়া শেয়ারহোল্ডার

শেয়ারহোল্ডারদের একটা শ্রেণি আছে, যার কথা এই বই এখনও বলেনি, আর সম্ভবত সেটাই সবচেয়ে বড়: যার হাতে আছে সামান্য কয়েকটা শেয়ার, সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে কেনা, যে প্রতিষ্ঠানের সে কাগজে-

কলমে সহ-মালিক, তার সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলার কোনো আসল ক্ষমতা ছাড়াই। সেই ছোট সঞ্চয়কারী, যে অবসরের জন্য কিছু সরিয়ে রেখেছিল; সেই কর্মী, যে বেতনের অংশ হিসেবে শেয়ার পেয়েছিল; সেই সাধারণ মানুষ, যে একটা প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাস করেছিল আর তার এক মুঠো শেয়ার কিনেছিল: তারা সব অর্থেই শেয়ারহোল্ডার, অথচ "শেয়ারহোল্ডার" শব্দটা সাধারণ কল্পনায় প্রায় সবসময়ই অন্য কাউকে মনে করায় — যারা পর্ষদে বসে, যারা শত শত কোটি নাড়াচাড়া করে, যারা একীকরণ আর অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ছোট শেয়ারহোল্ডার বাস করে এমন এক অবস্থায়, যা কোনো কর্পোরেট আইন প্রকাশ্যে স্বীকার করে না: কাগজে তার অধিকার আছে, আর বাস্তবে প্রায় কোনো ক্ষমতা নেই।

শেয়ারহোল্ডারদের সভার ভোট, যা হওয়ার কথা সেই হাতিয়ার, যার মাধ্যমে প্রতিটি শেয়ারহোল্ডার প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তে অংশ নেয়, তাদের কাছে হয়ে দাঁড়ায় প্রায় প্রতীকী এক অঙ্গভঙ্গি: তাদের অংশীদারি, তাদের মতো আরও লক্ষ লক্ষ ছোট অংশীদারির সঙ্গে যোগ হয়ে, বড় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের তুলনায় এক অতি ক্ষুদ্র ভাগাংশ ওজন বহন করে, যারা একটা মাত্র সিদ্ধান্তে যেকোনো ভোটের ফল ঘুরিয়ে দিতে পারে। ছোট শেয়ারহোল্ডার কথা বলতে পারে, কিন্তু কদাচিৎ সত্যিই প্রভাব ফেলতে পারে। সে তথ্য পায়, ত্রৈমাসিক রিপোর্ট, সরকারি বিবৃতি — কিন্তু সবসময় পায় তখন, যখন আসল সিদ্ধান্তগুলো ইতিমধ্যে অন্য কোথাও নেওয়া হয়ে গেছে, এমন ঘরে, যেখানে তার ঢোকার অধিকার কখনও ছিল না।

আর এখানে ছোঁয়া হয় এই অবস্থার সবচেয়ে অস্বস্তিকর অংশটা: ছোট শেয়ারহোল্ডারের কাছে নিজের ক্ষমতার অভাব পুষিয়ে নেওয়ার মতো টাকাও নেই। যার হাতে বিপুল পরিমাণ শেয়ার আছে, সে একটা শেয়ারে লোকসান সহিতে পারে, বিনিয়োগ ছড়িয়ে দিতে পারে, একটা বিনিয়োগ ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে পারে। যে নিজের সঞ্চয় বিনিয়োগ করেছে, প্রায়ই কৌশলের চেয়ে বেশি আস্থার ভিত্তিতে বেছে নেওয়া অল্প কয়েকটা প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীভূত করে, তার এই সুযোগ নেই। প্রতিষ্ঠানের অবস্থা খারাপ হলে সে একশোটা ভিন্ন বিনিয়োগে ছড়ানো এক সম্পদের নগণ্য একটা অংশ হারায় না — সে হারায়, কখনও কখনও, সারা জীবনের জন্য যা সরিয়ে রেখেছিল, অথচ যে

সিদ্ধান্তগুলো সেই পরিণতিতে নিয়ে গেছে, তাতে তার কখনও কোনো কথা বলার সুযোগ ছিল না।

এই বই যে পুরো ব্যবস্থার বর্ণনা দেয়, তাতে এটাই সম্ভবত সবচেয়ে নিঃশব্দ অন্যায: ছোট শেয়ারহোল্ডারকে বলা হয় একটা ব্যবসার পুরো ঝুঁকির ভাগ নিতে — সব খারাপ হলে সবকিছু হারানো — অথচ বিনিময়ে সেই সবকিছু কীভাবে পরিচালিত হবে তা ঠিক করার ক্ষমতার কোনো আসল অংশ তাকে দেওয়া হয় না। সে বাজির ভাগ নেয়, তাস খেলে যে হাত, তার নয়। কাগজে সে মালিক, সারবস্তুতে দর্শক। যে এই অবস্থা বেঁচে থেকেছে, হয়তো বছরের পর বছর ধরে গড়া সঞ্চয়ের মূল্য কমে যেতে দেখেছে অন্যের নেওয়া সিদ্ধান্তে, কখনও না দেখা ঘরে, কখনও সত্যিই ভাগ না করা কারণে, সে নিজের সঙ্গে বয়ে বেড়ায় এমন এক প্রশ্ন, যা এই বই তার প্রথম পাতা থেকে সরাসরি তাকেই করেছে: যদি তুমি এমন কিছু একটা অংশের মালিক হও, যার ভাগ্যে তুমি সত্যিই প্রভাব ফেলতে পারো না, তাহলে তুমি আসলে কীসের মালিক? হয়তো সেই ক্ষমতার নয়, যা “শেয়ারহোল্ডার” শব্দটা ইঙ্গিত করে। কিন্তু অন্তত, এই বই যদি নিজের উদ্দেশ্যে সফল হয়ে থাকে, সে যে শৃঙ্খলের অংশ, তা অবশেষে পুরোপুরি দেখার সম্ভাবনা — আর সেই সচেতনতা নিয়ে বাছাই করার: থাকবে কি না, আরও জানবে কি না, তার মতো অন্যদের সঙ্গে মিলে দাবি করবে কি না, যে শৃঙ্খলটা একদিন যেমন পেয়েছিল তার চেয়ে ন্যায্য হয়ে উঠুক।

উপসংহার ও মন্তব্য

যে এই পাতাগুলোতে এসে পৌঁছেছে, সে পুরো শৃঙ্খলটা পেরিয়ে এসেছে: পণ্য আর পেটেন্ট, কারখানা আর বাজার, ম্যানেজমেন্ট আর তার স্তরগুলো, ব্যালান্স শিট আর শেয়ারবাজার, একেবারে সেই শেয়ারহোল্ডার পর্যন্ত, যে সবকিছুর শেষে পায় কেবল একটা সংখ্যা। এই যাত্রায় পেরিয়ে আসা কোনো ধাপকে দোষী সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্য ছিল না। বর্ণনা করা প্রতিটি যন্ত্রাংশ — বারকোড, সেলস বোর্ড, শেয়ার, বাইরের বিশ্লেষক — টিকে আছে একটা বৈধ প্রযুক্তিগত কারণে, আর এই যন্ত্রাংশগুলোর কোনোটাই, আলাদা করে ধরলে, কোনো কিছুর জন্য দোষী নয়।

বিশ্বাসঘাতকতা, যখন ঘটে, কখনও একটা মাত্র ধাপে থাকে না। তা থাকে হাজারটা ছোট দূরত্বের নিঃশব্দ জমে ওঠায়, যার প্রতিটি আলাদা করে ন্যায্য ঠিক করা যায়, আর যারা মিলে একটা প্রতিষ্ঠানকে তার নিজের উৎস থেকে আলাদা করে দেয়, অথচ কেউ কখনও কোনো নির্দিষ্ট দিনে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার সিদ্ধান্ত নেয়নি। এই বই কোনো দোষী খুঁজতে যায়নি। সে চেয়েছে এমন এক কলকবজাকে দৃশ্যমান করতে, যা অন্যথায় অদৃশ্যই থেকে যায়, ঠিক এই কারণে যে তা এত বেশি হাতে ছড়িয়ে আছে, যে কোনো একজনের ঘাড়ে তা চাপানো যায় না।

এই বই যে মন্তব্যগুলো উসকে দেবে — আর দেবেই, কারণ এটা এমন স্নায়ুতে হাত দেয়, যেখানে সেই ঘরগুলোতে কদাচিৎ জোরে হাত দেওয়া হয়, যেখানে এই সব কিছু আসলে ঘটে — তার উত্তর আগেভাগেই একটা কথায় দিয়ে রাখা ভালো: এটা পুঁজিবাদের, প্রতিষ্ঠানের, মুনাফার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগপত্র নয়। এটা স্মৃতির প্রতি এক আহ্বান। পুঁজিবাদ, প্রতিষ্ঠান, মুনাফা হাতিয়ার — অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার, যারা নিজেদের উৎসের প্রতি বিশ্বস্ত থাকলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য আসল মূল্য তৈরি করতে পারে, আর তা ভুলে গেলে সমস্ত অর্থ থেকে নিজেদের শূন্য করে ফেলতে পারে। এই বই চায় না এই হাতিয়ারগুলো ফেলে দেওয়া হোক। সে চায়, আমরা প্রতিদিন মনে রাখি, কেন প্রথমবার আমরা এগুলো বেছে নিয়েছিলাম।

যে সারা জীবন এই কাঠামোগুলোর ভেতরে কাজ করেছে, আর নিজের চোখের সামনে বিশ্বস্ততা আর বিশ্বাসঘাতকতা দুটোই ঘটতে দেখেছে, সে জানে, কোনো আইনি সংস্কার, কোনো নতুন ব্যালান্স শিট সূচক, কোনো নতুন নৈতিক সনদ কখনও সেই একমাত্র সত্যিকারের সুরক্ষার জায়গা নেবে না, যা এই পাতাগুলোতে বলা অধঃপতনের বিরুদ্ধে আছে: প্রতিটি কাঠামোয় কেউ একজন, যে বারবার জিজ্ঞেস করে চলে, কেন।

ভাবনা ও কৃতজ্ঞতা

এই পাতাগুলোতে লেখা প্রতিটি শব্দের জন্ম সারা জীবনের পর্যবেক্ষণ থেকে, টেবিলে বসে পড়া কোনো তত্ত্ব থেকে নয়। যে দশকের পর দশক একটা প্রতিষ্ঠানের করিডর দিয়ে হেঁটেছে — দর্শনার্থী হিসেবে নয়,

ক্ষণিকের পরামর্শদাতা হিসেবে নয়, বরং এমন একজন হিসেবে, যে প্রতিদিন সেই করিডরে বেঁচেছে, আর সবার মতোই একই পরিশ্রম আর একই বিশ্বস্ততা নিয়ে — সে বহন করে এমন এক কর্তৃত্ব, যার জায়গা কোনো অ্যাকাডেমিক উপাধি নিতে পারে না: এই বই যে মহত্ত্ব আর অধঃপতনের কথা বলে, দুটোই কাছ থেকে দেখার কর্তৃত্ব।

এই বই সম্ভব হত না তাঁদের ছাড়া, যাঁরা আমার আগে আমাকে শিখিয়েছেন — পাঠ দিয়ে নয়, প্রতিদিনের দৃষ্টান্ত দিয়ে — একটা উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার মানে কী, এমনকি যখন প্রশ্নটা করা থামিয়ে দেওয়াই সহজ হত। এই পাতাগুলোর প্রথম ভাবনা তাঁদের জন্য, এমনকি যখন তাঁদের নাম সরাসরি নেওয়া হয়নি: তাঁরা আছেন প্রতিটি অধ্যায়ে, প্রতিটি লাইনে, যা নিঃশব্দ নির্ণায়ক কথা বলে, এমন যত্নের কথা, যা কেউ মাপে না, এমন কাজের কথা, যা ভালোভাবে করা হয়েছিল এমনকি যখন কেউ দেখছিল না।

একটা ভাবনা যায় তার জন্যও, যে এই পাতাগুলো পড়ে এখানে বলা বহু চরিত্রের কোনো একটায় নিজেকে চিনতে পারে — কর্মী, এজেন্ট, মাঝারি স্তরের ম্যানেজার, ক্ষমতাহীন ছোট শেয়ারহোল্ডার। এই মানুষদের মধ্যে একজনও যদি বইটা বন্ধ করে প্রথমবার নিজেকে পুরোপুরি দেখা হয়েছে বলে অনুভব করে — একটা স্তর, একটা সূচক, একটা টেবিলের একটা লাইনে নামিয়ে আনা হয়নি — তাহলে এই বই সেই কাজটা করেছে, যার জন্য এটা লেখা হয়েছিল।

আর একটা শেষ ভাবনা, তার জন্য, যার সাহস আছে সেই প্রশ্নটা করে চলার, যা এই বইয়ের প্রতিটি পাতা জুড়ে বয়ে চলে, এমনকি যখন প্রশ্নটা করার একটা দাম আছে — সময়, আরাম, কখনও কখনও এমন এক কাঠামোয় নিজের জায়গাটাও, যে প্রশ্নটা শুনতে না পেলেই খুশি। তারাই, অন্য যে কারও চেয়ে বেশি, বাঁচিয়ে রাখে সেই আত্মাকে, যার কথা এই বই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলেছে। এই বই লেখা তাদের জন্য, আর তাদের কারণেই।

প্রিয় শেয়ারহোল্ডারগণ,

আমি আপনাদের লিখছি না একজন প্রশাসক হিসেবে, না একজন এক্সিকিউটিভ হিসেবে, না এমন কেউ হিসেবে, যে আপনাদের কাছে একটা ত্রৈমাসিকের হিসাব দিতে বাধ্য। আমি আপনাদের লিখছি এমন একজন হিসেবে, যে সারা জীবন কাটিয়েছে একটা প্রতিষ্ঠানের সারবস্তুর ভেতরে — খবরের কাগজে তার ছবির মধ্যে নয়, তার শেয়ারের দামের মধ্যে নয়, বরং তার করিডরে, তার কারখানায়, সেই মানুষদের মুখে, যারা প্রতিদিন তাকে সত্যিই অস্তিত্বে রাখে।

আমি আপনাদের এমন কিছু বলতে চাই, যা কোনো ব্যালাঙ্গ শিট আপনাদের কখনও বলবে না: আপনাদের হাতে থাকা অংশীদারি শুধু ওঠানামা করা একটা সংখ্যা নয়। তা একটা মানবিক উদ্দেশ্যের একটা অংশ, ছোট বা বড়, যা কেউ একজন, বহু দিন আগে, এতটাই চেয়েছিল যে তাকে অস্তিত্বে এনেছিল। আপনারা যে প্রতিটি ডিভিডেন্ড পান, তার পেছনে আছে কারও কথা ভেবে তৈরি একটা পণ্য, একজন কর্মী, যে যত্ন নিয়ে তা বানিয়েছে, একজন গ্রাহক, যে তার ওপর আস্থা রাখা বেছে নিয়েছে। এই বই আপনাদের নিয়ে গেছে সেই পুরো শৃঙ্খলের ভেতর দিয়ে, যা আপনাদের অংশীদারিকে সেই মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে জোড়ে — কখনও এখনও জীবন্ত, কখনও ইতিমধ্যে ভুলে যাওয়া, প্রায় সবসময়ই কোনো ত্রৈমাসিক রিপোর্ট যতটা আন্দাজ করতে দেয় তার চেয়ে দূরে।

আমি আপনাদের সংখ্যার দিকে তাকানো বন্ধ করতে বলছি না। সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ, আর তাদের উপেক্ষা করে কেউ কোনো সম্পদ পরিচালনা করতে পারে না। আমি আপনাদের বলছি, শুধু এটুকু, তার বাইরেও তাকাতে। পরের বার যখন কোনো ত্রৈমাসিক রিপোর্ট পড়বেন, নিজেকে শুধু এটা জিজ্ঞেস করবেন না যে সংখ্যাটা বেড়েছে কি না, বরং এটাও যে যা তাকে তৈরি করেছে, তা এখনও সেই কারণের প্রতি বিশ্বস্ত কি না, যার জন্য প্রতিষ্ঠানটা জন্মেছিল। এই প্রশ্ন আপনারা কোনো সরকারি নথিতে লেখা কখনও পাবেন না। এটা এমন এক প্রশ্ন, যা করার অধিকার — আর হয়তো কর্তব্যও — কেবল আপনাদেরই আছে, মালিক হিসেবে।

এটা জানলে আপনাদের হাতে এখন যতটা ক্ষমতা আছে তার চেয়ে বেশি ক্ষমতা আসবে না। কিন্তু এটা আপনাদের এমন কিছু দেবে, যা কেবল ক্ষমতা কখনও নিশ্চিত করে না: আপনারা সত্যিই কীসের মালিক, তার

সচেতনতা। আর আপনাদের মধ্যে একজনও যদি এই পাতাগুলো পড়ে নিজের অংশীদারিকে অন্য চোখে দেখার সিদ্ধান্ত নেন — আর শুধু ওঠানামা করা একটা শেয়ার হিসেবে নয়, বরং এমন এক মানবিক গল্পের জীবন্ত অংশ হিসেবে, যা মনে রাখার যোগ্য — তাহলে এই বই, আর যে সারা জীবনের কাজ একে সম্ভব করেছে, দুটোই নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছেছে।

শ্রদ্ধা সহ, আর বরাবরের মতো একই বিশ্বস্ততায়,

লেখক

টীকা

“একটা মানবিক সৃষ্টির কী হয়, যখন সে তার স্রষ্টার চেয়ে অনেক বেশি দিন বেঁচে থাকে?” এই বই পড়ার পর এটাই হবে সেই প্রশ্ন, যা তুমি নিজেকে করে চলবে, সবসময়, আর উত্তর সবসময় হবে একটাই, কেবল একটাই: যে ভুলগুলো করেছিল, তাকেই জিজ্ঞেস করো — কেবল সে-ই তোমাকে বলতে পারে।

Ferdinando Frega